বিজ্ঞান ও ধর্ম

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী সত্যব্রতানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলিকাতা- ৭০০০০৩

প্রথম সংস্করণ
উদ্বোধন বাড়ীতে শ্রীশ্রীমায়ের শুভ পদার্পণতিথি
১৭ জুন ১৯৬৪

বর্ণসংস্থাপক
শিক্ষা-সম্প্রসারণ নিয়ামক
২৪/এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক ঃ
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড, কলিকাতা- ৭০০০৩০

প্রকাশকের নিবেদন

ঔপনিষদিক যুগ থেকে ভারতবর্ষের ধর্মসাধনার প্রয়াস অব্যাহত। এর মূল ভিত্তি ছিল যুক্তিবিশ্বাস—যা আধ্যাত্মিক অনুভূতির পথে এগিয়ে যাবার জ্বলন্ত প্রেরণা। বর্তমানে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম সেতুবন্ধন রচনা করেছে। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়ে'Science and Religion' শীর্ষক বক্তৃতায় শুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চা ও তার সত্যানুসন্ধান কিভাবে মানব-কল্যাণ সাধন করে, ধর্ম এবং বিজ্ঞানের সমন্বয়ে কিভাবে শ্রদ্ধার ভাব জাগরিত হয়, তা অত্যন্ত মার্জিত এবং পরিশীলিত ভাষায় সাবলীল ভঙ্গিতে সুন্দরভাবে পাঠক মনের উপযোগী করে ব্যক্ত করেছেন। ইংরেজী পুস্তিকাটির বঙ্গানুবাদ করেছেন শ্রীযুক্ত শৈবাল সরকার। তাঁর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটি পাঠ করে যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ যদি বিন্দুমাত্র অন্তরজীবন সম্পর্কে আগ্রহী হয়, তবে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব।

সূচীপত্র

বিজ্ঞান ও ধর্ম

বিশ্বাস ও যুক্তি

বিজ্ঞান ও ধর্ম

১ প্রাক্‌কথন

'বিজ্ঞান, সমাজ এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি', শীর্ষক বক্তৃতামালার প্রথম উদ্বোধন পর্বে 'বিজ্ঞান ও ধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতাদানের আমন্ত্রণে আমি ধন্য। এই প্রসঙ্গে আমি বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাননীয় উপাচার্য মহোদয়ের কাছে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

২ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি জাগরূক রাখার প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক পরিবেশগত সমস্যা ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের সমস্যার কারণে পৃথিবীতে, বিশেষত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলিতে, অত্যধিক প্রযুক্তিনির্ভরতা ক্রমশ যেন জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। অন্যদিকে শুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চা, তার সত্যানুসন্ধান ও মানবকল্যাণের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, চিরকাল মানবজাতির একটি মহান ব্রত হিসাবে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। আমাদের দেশ এই ব্রত অনুসরণ করে এসেছে ভৌতবিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের আঙিনায়—ভবিষ্যতেও আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের সব ধারাতেই তাকে এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। ঔপনিষদিক ধারা দেখিয়ে দেয় যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাগতিক তথ্যাবলী থেকে সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সত্যগুলিতে এগিয়ে যাবার যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শন সেই পথেই এগিয়েছে। আমি আমার বক্তব্যে সেইটিই তুলে ধরার চেষ্টা করব। আমি বাঙ্গালোর বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাব কারণ তাঁরা তাঁদের ছাত্র, অধ্যাপক ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে উন্নত করে তোলার নবীন

প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। আমি মনে করি, আমাদের জনসাধারণকে এই দৃষ্টিভঙ্গি ও চেতনায় জাগরিত করতে গেলে প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায় থেকে এই প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। কেবল এই পথেই আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যটি শক্তিশালী ও পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবে এবং যা কিছু দুর্বল, অপবিত্র ভাবনা শতাব্দীর পর শতাব্দী যাদুবিদ্যা ও কুসংস্কারের মধ্য দিয়ে আমাদের ঐতিহ্যকে আচ্ছাদিত করেছে তা দূরীভূত হবে।

৩ বিজ্ঞান ও ধর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক ঃ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি

আধুনিক মানুষের কাছে বিজ্ঞান ও ধর্ম এই দুটি বিষয় ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ভারতীয় প্রজ্ঞার আলোকে যদি দেখার চেষ্টা করি, তাহলে মনে হয় এই দুটি বিষয়কে আলাদা করে দেখলে শেষ পর্যন্ত ফললাভের চেয়ে বিফলতার সম্ভাবনাই বেশি—অন্যদিকে দুটিকে সুন্দরভাবে মেলাতে পারলে মানবজাতির প্রতিভার এক পূর্ণ ও সুষম বিকাশ ঘটে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গত কয়েক শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে এই দুটির সম্পর্ক খুব একটা মধুর নয়। সেইসঙ্গে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে পৃথিবীর সব জায়গাতেই এই মধুরতার অভাব পরিলক্ষিত। তবে বর্তমানে বিংশ শতাব্দীতে একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি উঠে আসছে ও সেইসঙ্গে বিজ্ঞান ও ধর্ম এই দুটি বিষয়ের প্রতিনিধি ও প্রবক্তাদের নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করতে দেখা যাচ্ছে। ক্রমশ তাঁরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন যে, বিজ্ঞান ও ধর্ম নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রেখে মানবকল্যাণের স্বার্থে পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে পারে। ক্রমশ এই বোধটি জেগে উঠছে যে, বিজ্ঞানের নীতিগুলি গ্রহণ করে ধর্ম নিজেকে সুদৃঢ় করতে পারে—অন্যদিকে ধর্মের মূলগত সত্য বিজ্ঞানকে আজও গভীর ও শক্তিশালী করে তুলতে পারে। আমি উভয়ের দ্বন্দ্ব ও মিলনের ক্ষেত্রগুলি ও তার উৎস সামনে আনার চেষ্টা করব। সেইসঙ্গে ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক

ঐতিহ্য যে সমন্বয় সাধনের পথ দেখিয়েছে সেই পথ ধরে মানুষের সামগ্রিক জ্ঞানের আলোকে বিজ্ঞান ও ধর্মকে আলোচনা করার চেষ্টা করব।

৪ বিজ্ঞান ও তার চর্চা

আধুনিক বিজ্ঞান নামে যা প্রচলিত তা মানুষের মনকে ক্রমোন্নয়নে নিয়ে যাবার একটি প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে। এরই ফল আজকের সভ্যতা—যার মধ্যে আমরা বেঁচে আছি। আমরা যখন বিজ্ঞানকে অধ্যয়ন করি নিষ্ঠার সঙ্গে, বিশেষত মহান বৈজ্ঞানিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তখন আমরা বিজ্ঞানচর্চার দুটি ধারা লক্ষ্য করি—একটি শুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চা যেখানে প্রকৃতির মাঝে নিরপেক্ষ অনুসন্ধান চালিয়ে মূলগত সত্যগুলি আবিষ্কার করাই লক্ষ্য। দ্বিতীয়টি ফলিত বিজ্ঞানের চর্চা যেখানে শুদ্ধ বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মাধ্যমে নানাভাবে মানবজীবনকে সমৃদ্ধ করার কাজ এগিয়ে চলেছে। এই উভয় ধারাই পরস্পর সম্পর্কিত। একটি ধারায় বিজ্ঞানের ভূমিকা আলোকপাতের, অপর ধারায় বিজ্ঞানের ভূমিকা ফললাভের—একটি অপরটির সঙ্গে যুক্ত। জ্ঞানার্জন মানুষকে শক্তি এনে দেয়—যে শক্তিবলে সে প্রাকৃতিক শক্তিগুলি করায়ত্ত করে। আর তার ফল আমাদের সামনে—আধুনিক সমাজজীবনে। বিশ্বব্যাপী যে প্রযুক্তির জোয়ার ও সভ্যতার যে আধুনিক রূপ তা সম্ভব হয়েছে এই আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির ফলে। মহাকাশ অভিযান, পারমাণবিক গবেষণার অত্যাধুনিক যুগের দ্বার খুলে দিয়েছে, লুপ্ত প্রাকৃতিক শক্তিকে ছিনিয়ে এনেছে মানুষ নিজের আয়ত্তে, নব নব সত্যের দরজা দিয়েছে খুলে। মানবমনের এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের বিস্মিত করে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে—এই অভাবনীয় ফলপ্রাপ্তি সম্ভব হয়ে চলেছে মানবচিন্তার কোন্ পথ অনুসরণের ফলে? চিন্তার জগতে 'আধুনিক' বলতে আমরা কি বুঝি?

আধুনিক বিজ্ঞান চিন্তার বৈশিষ্ট্য-ই বা কি যার ফলে বৈজ্ঞানিক গবেষণা হতে পেরেছে? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজলেই আমরা সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য চর্চার দিকগুলি, যেমন ধর্ম, নীতিবিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি ও শিল্পচর্চা ইত্যাদির আধুনিক বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝতে পারব।

আধুনিক পৃথিবীর নির্মাতা বিজ্ঞান, অতএব আধুনিক চিন্তার অর্থ বৈজ্ঞানিক চিন্তা। বিজ্ঞানের লক্ষ্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও মানুষের অভিজ্ঞতাকে অধ্যয়ন করে যাওয়া, কার্ল পিয়ার্সনের ভাষায় ঃ (Grammar of Science, 1900, p. 6)

'বিজ্ঞানের কাজ হলো জাগতিক ঘটনাগুলির শ্রেণীবিভাগ, তাদের স্বকীয় ও পারস্পরিক ব্যবহারের স্বরূপ উন্মোচন। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো পারস্পরিক ব্যক্তিনিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এই ঘটনাগুলি থেকে সত্যে পৌঁছবার প্রবণতা। তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতির রহস্যের দ্বার খুলে দিয়েছে। ক্রমশ নতুন নতুন ক্ষেত্রে ঘটেছে বিজ্ঞানের বিচরণ। প্রাকৃতিক শক্তিগুলি হয়ে উঠেছে মানুষের সেবক। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয়ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফল ব্যাপক। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা—অন্যদিকে জীবন বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান এবং এর প্রত্যেকটির অসংখ্য শাখা-প্রশাখা মানবসভ্যতাকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। এই সমৃদ্ধির পাশে অতীতের সব অগ্রগতি ম্লান হয়ে গেছে। এই আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান।'

৫ বিজ্ঞান বনাম বিজ্ঞানের নানা বিভাগ

এই যে বিজ্ঞানকে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি, এ কোন তথ্যাবলীর তালিকা নয়। বিখ্যাত জীব-বিজ্ঞানী জে. আর্থার টমসনের ভাষায় ঃ (Introduction to Science, Home University Library Edition, p. 58)

'বিজ্ঞান, তথ্যাবলীর তালিকা প্রকাশে শেষ হয় না। বিজ্ঞানের অর্থ একধরনের বৌদ্ধিক দৃষ্টিভঙ্গি। কোন বিশেষ অনুসন্ধানেই এর কাজ শেষ হয় না। বিজ্ঞান এক নিষ্ঠাবান অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি যা একমাত্র প্রমাণের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির কিছু বাস্তব উদাহরণ আমরা দেখতে পাই, যখন একজন ব্যবসায়ীকে দেখি বাস্তব সমস্যার সম্মুখীন হতে অথবা একজন আইনজীবীকে প্রমাণ করবার প্রয়াসে বা রাজনৈতিক নেতাকে নতুন গঠনমূলক পরিকল্পনা প্রণয়নে।'

চিন্তায় ও তার প্রকাশে সূক্ষ্ম ও নিরপেক্ষ বিচারই হলো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে কোন ক্ষেত্রেই অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখতে পেলে আমরা তাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বা সংক্ষেপে বিজ্ঞান বলব। সুতরাং বিজ্ঞান বলতে ঐ তথ্যাবলীর তালিকা নয় যা বিজ্ঞানের নানা শাখা-প্রশাখা যথা পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদিতে ছড়িয়ে রয়েছে। এই বিভিন্ন বিভাগগুলির পরিসর সীমাবদ্ধ, কিন্তু বিজ্ঞান তো সীমাবদ্ধ নয়। এই বিভাগগুলিও একসময় তাদের সীমা অতিক্রমের চেষ্টা করে ও একটা অবস্থায় আসতে চায়, যখন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান একটা সামগ্রিক অনুভূতির অর্থ বোধের জন্য ব্যাকুল। এই উদার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মানুষ তার অন্তর্জগতের সত্যগুলিও জানতে চায়। এই অন্তর্জগতের বিজ্ঞান-ই ধর্মের বিজ্ঞান এবং প্রাচীন ভারতীয় ভাবনায় ও আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যায় একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়েছে, যার ফল মানবসভ্যতার ইতিহাস গঠনে সুদূর প্রসারী।

৬ অনুসন্ধানী স্বভাব

আধুনিক বিজ্ঞানের মূল বৈশিষ্ট্যই হলো স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করে যাওয়ার প্রবণতা। এর ফলেই সম্ভব হয়েছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি।

যে মন ক্রমাগত প্রশ্ন করে চলে ও প্রত্যেকটি উত্তরকে যাচাই করে নেয়, সেই মনের অদম্য গতিশীল শক্তি-ই জড়জগতে ও চিন্তার জগতে নতুন পথের সন্ধান দেয়। চলার পথে এই শক্তি আঘাত করে অপরীক্ষিত সব অন্ধ আরামদায়ক বিশ্বাসকে। মহান ধর্মতত্ত্বের মধ্যে যে কুসংস্কার, যে যাদুবিদ্যা জড়িয়ে থেকে তাকে আমাদের সামনে অপবিত্র ও অসংস্কৃত করে রেখেছে, সেগুলিকে এই দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই সহ্য করে না। নানা কুসংস্কার, যাদুবিদ্যা, প্রচলিত বিশ্বাস ইত্যাদির দুর্ভেদ্য আবরণের বিরুদ্ধে আমাদের পরীক্ষিত জ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে উঠে এসেছে শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। পাশ্চাত্যে এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাকে জন্মলগ্নেই বাধা দেবার চেষ্টা করেছে সংগঠিত ধর্মবিশ্বাসীর দল। এই অনুসন্ধিৎসাকে তার অগ্রগতির পথেও পদে পদে বাধা দিতে লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের আলোকে সমস্ত অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। উপনিষদের ভাষায় ঃ (মাণ্ডুক্য উপনিষদ্, ৩য় বল্লী, ১/৬) *'সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্'*—'সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার নয়।'

বিংশ শতাব্দীব্যাপী যে বিজ্ঞানের ইতিহাস, তা হলো এই স্বাধীন অনুসন্ধিৎসার জয়যাত্রা, বিশেষত সব রকমের অপরীক্ষিত বিশ্বাস ও অপরীক্ষিত মতামতের বিরুদ্ধে। এই সাহসিক অভিযান মানবজাতিকে সমৃদ্ধ করেছে জাগতিক ক্ষেত্রে ও চিন্তার জগতে। ফলে বিজ্ঞান আলো জ্বেলেই সন্তুষ্ট থাকে নি, সমস্ত পৃথিবীকে বদলে দিয়েছে তার নব নব আবিষ্কারগুলি দিয়ে।

৭ একদেশদর্শী ধর্মমতের কালো ছায়া

বিজ্ঞানের সফলতা মানেই তার বিরুদ্ধবাদীদের পরাজয়। ইতিহাসে, বিশেষত আধুনিক ইউরোপের ইতিহাসে এইটাই একটি দুর্ভাগ্যজনক

আখ্যান যে, বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে, তার স্বাধীন অনুসন্ধানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে যে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস, তার উৎস ধর্ম। ফলে যে যুক্তিবিচার বিজ্ঞানের প্রাণ, তাই হয়ে দাঁড়াল ধর্মের মৃত্যুঘণ্টা। তাই এই শতাব্দীর শেষভাগে এসে বিজ্ঞান পেয়েছে প্রতিপত্তি, পেয়েছে সর্বজনগ্রাহ্য কর্তৃত্ব, অপর দিকে প্রথমে এক মারাত্মক ভুল এবং পরবর্তীকালে অক্ষতিকর সস্তা যাদুবিদ্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে ধর্ম তার মর্যাদা হারিয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে তাই দেখলাম সমগ্র পাশ্চাত্য জুড়ে ধর্মের ওপর প্রসারিত এক কালোছায়া। কিছু চিন্তাশীল মানুষ একটা অস্বস্তিতে ছিলেন। তাদের মনে হয়েছিল, মানবসভ্যতার কোন অমূল্য সম্পদকে বোধ হয় অবহেলা করে সরিয়ে দেওয়া হলো। তাঁরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ধর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নতুন করে বুঝতে চেষ্টা করলেন। এই যুক্তি ও বিশ্বাসের সেতুবন্ধনের কাজ, আধুনিক মননকে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তোলার উদ্যম কেবলমাত্র মানুষের একটা পূর্ণ স্বরূপের ভিত্তিতে ও তার জীবনের এক আধ্যাত্মিক স্বরূপের ভিত্তিতেই সম্পন্ন করা যায়, আর সেক্ষেত্রে ভারতীয় চিন্তার অবদান অপূর্ব ও চিরস্থায়ী।

৮ 'যুক্তি ও ধর্ম' বিষয়ে বিবেকানন্দ

পাশ্চাত্যে বিজ্ঞান ও ধর্মের একটা ধারাবাহিক সংঘর্ষ অনুসন্ধান করতে গিয়ে স্বামীজী দেখলেন একটা উদার অথচ যুক্তিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির একান্ত অভাব। তাঁর কথায় ঃ (স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১৪)

'ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতির্বিদ ও বৈজ্ঞানিকদের মতবাদ কি, তা আমরা জানি, আর এ-ও জানি যে এটি প্রাচীন ধর্মতত্ত্ববাদিদের কতটা ক্ষতি করেছে, যখনই এক-একটি নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্ভব হচ্ছে,

তখনই যেন তাঁদের ঘরে একটি করে বোমা পড়ছে। আর সেইজন্যে তাঁরা সব যুগেই এই সব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করেছেন।'

ধর্ম যখনই যুক্তিবিচারের সাহায্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তখনই ধর্ম নিজেকে করেছে দুর্বল। এই বিষয়টি উত্থাপন করে ইংল্যাণ্ডে ১৮৯৬ সালে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অবিস্মরণীয় বক্তৃতা 'যুক্তি ও ধর্ম'-র মধ্যে বললেন : (তদেব, পৃঃ ১৩২)

'ভিত্তিগুলি শিথিল হয়ে গেছে—আর আধুনিক মানুষ প্রকাশ্যে যাই বলুক না কেন, অন্তরের গোপন প্রদেশে এ-বোধ জাগ্রত যে, সে আর 'বিশ্বাস' করতে পারে না। আধুনিক যুগের মানুষ জানে যে, পুরোহিত-সম্প্রদায় তাকে বিশ্বাস করতে বলছে বলেই, কোন শাস্ত্রে লেখা আছে বলেই, কিংবা তার স্বজনেরা চাইছে বলেই কিছু বিশ্বাস করা তার পক্ষে অসম্ভব। অবশ্য এমন কিছু লোক আছে, যাদের তথাকথিত জনপ্রিয় বিশ্বাসে সম্মত বলে মনে হয়, কিন্তু এ-কথাও আমরা নিশ্চয় জানি যে, তারা বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা করে না। তাদের বিশ্বাসের ভাবটিকে "চিন্তাহীন অনবধানতা" আখ্যা দেওয়া চলে।'

যুক্তির প্রয়োগকে সমর্থন করতে গিয়ে তিনি বললেন : (তদেব, পৃঃ ১৩২)

'অন্যান্য বিজ্ঞানগুলির প্রত্যেকটিই যুক্তির যেসব আবিষ্কারের সহায়তায় নিজেদের সমর্থন করছে, ধর্মকেও কি আত্ম-সমর্থনের জন্যে সেগুলির সাহায্য নিতে হবে? বহির্জগতে বিজ্ঞান ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তথ্য অনুসন্ধানের যে পদ্ধতিগুলি নেওয়া হয়, ধর্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও কি সেই একই পদ্ধতি অবলম্বিত হবে? আমার মতে, তাই হওয়া উচিত। আমি এ-ও মনে করি, যত তাড়াতাড়ি তা হয়, ততই মঙ্গল। এরকম অনুসন্ধানের ফলে কোন ধর্ম যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে—সেই ধর্ম বরাবরই

অনাবশ্যক কুসংস্কার মাত্র ছিল। যত শীঘ্র তা লোপ পায় ততই মঙ্গল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার বিনাশেই সর্বাধিক কল্যাণ। এই অনুসন্ধানের ফলে ধর্মের যা কিছু খাদ আছে, সে সবই দূরীভূত হবে নিঃসন্দেহে, কিন্তু ধর্মের যা সারভাগ তা এই অনুসন্ধানের ফলে বিজয়-গৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াবে। পদার্থবিদ্যা বা রসায়নের সিদ্ধান্তগুলি যতটা বিজ্ঞানসম্মত, ধর্ম যে ততটা বিজ্ঞানসম্মত হবে, শুধু তাই নয়, বরং আরও বেশি জোরালো হবে, কারণ জড় বিজ্ঞানের সত্যগুলির পক্ষে সাক্ষ্য দেবার মতো আভ্যন্তরীণ আদেশ বা নির্দেশ কিছু নেই, কিন্তু ধর্মের তা আছে।'

উপনিষদ্ অধ্যয়ন করে আমরা বুঝতে পারি, ভারতবর্ষে ধর্মের বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান করা হয়েছে অত্যন্ত নিরপেক্ষ ও মুক্ত চিন্তার পথ ধরে। অধ্যয়নের লক্ষ্য এখানে সত্যের অনুসন্ধান, কোন মনোমুগ্ধকর কাল্পনিক ধারণা বা কোন আদিম কুসংস্কারের একটা প্রতিরূপ তৈরি করে তার অনুসরণ নয়।

বহু বক্তৃতা ও আলোচনাতে স্বামী বিবেকানন্দ এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপিত করেছেন, সেটি ভারতীয় চিন্তাধারার একটি মূল সূত্র। তাঁর 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' বক্তৃতায় (তদেব, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১) তিনি বলেন ঃ

'জ্ঞানের একমাত্র উৎস অভিজ্ঞতা, জগতে ধর্মই একমাত্র বিজ্ঞান যাতে নিশ্চয়তা নেই, কারণ অভিজ্ঞতামূলক শাস্ত্র হিসেবে এটা শেখানো হয় না। এটা উচিত নয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে ধর্মশিক্ষা দেন, এমন কিছু লোক সবসময় দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের রহস্যবাদী (Mystic) বলা হয়ে থাকে এবং প্রতি ধর্মেই এই রহস্যবাদিগণ একই ভাষায় কথা বলে থাকেন ও একই সত্য প্রচার করেন। এটাই প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞান। জগতে স্থানভেদে যেরকম গাণিতিক সত্যের তারতম্য হয় না, এই মরমী সাধকদের মধ্যেও কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তাঁরা একই উপাদানে গঠিত ও

সমভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের উপলব্ধি এক এবং এই উপলব্ধ সত্যই নিয়ম হিসেবে পরিগণিত।... রসায়ন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানগুলি যেমন জড়বস্তু-কেন্দ্রিক, ধর্মের কেন্দ্র সেরকম অতীন্দ্রিয় জগতের ব্যাপার। রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করতে গেলে প্রকৃতি-রাজ্যের গ্রন্থটি অধ্যয়ন করতে হয়। অন্যদিকে ধর্মশিক্ষার গ্রন্থ হলো নিজের মন ও হৃদয়, ঋষিগণ প্রায়শ জড় বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ, কারণ জড় বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবার জন্যে তাঁরা অন্তর-গ্রন্থরূপ বিপরীত গ্রন্থ পাঠ করে থাকেন, বৈজ্ঞানিকেরাও সেরকম ধর্মবিজ্ঞানে প্রায়শ অনভিজ্ঞ, কারণ তিনিও ধর্মবিজ্ঞান-সম্পর্কিত জ্ঞানদানে সম্পূর্ণ অসমর্থ বাইরের পুস্তকখানি কেবল পাঠ করে থাকেন।'

ভারতের চিন্তানায়কেরা মানবজাতির জীবন ও কর্মপ্রবাহের দুটি ধারা আবিষ্কার করলো, একটি বাইরের জগতে, দ্বিতীয়টি অন্তরে।

দুটি ধারাই ভিন্নখাতে প্রবাহিত। যে কোন একটির অধ্যয়নে অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ হয় না। একটির দৃষ্টিকোণ থেকে অপরটির বিচার সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে দেয় না। কিন্তু একটির সিদ্ধান্তগুলির আলোকে অপর ধারাকে অধ্যয়ন করে গেলে গবেষণা পূর্ণাঙ্গ ও অনেক প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে।

এই প্রসঙ্গে 'সাংখ্যীয় ব্রহ্মতত্ত্ব' বক্তৃতায় স্বামীজী বলছেন ঃ (তদেব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩)

'দুইটি শব্দ রয়েছে—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড, অন্তঃ ও বহিঃ, আমরা অনুভূতি দ্বারা এই উভয় থেকেই সত্য লাভ করে থাকি—অভ্যন্তর অনুভূতি ও বাহ্য অনুভূতি। অভ্যন্তর অনুভূতি দ্বারা সংগৃহীত সত্যসমূহ—মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম নামে পরিচিত, আর বাহ্য অনুভূতি থেকে জড় বিজ্ঞানের উৎপত্তি। এখন কথা এই, যা পূর্ণ সত্য, তার সঙ্গে এই উভয় জগতের অনুভূতিরই সামঞ্জস্য থাকবে। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড

বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সত্যসমূহে যেমন সাক্ষ্য প্রদান করবে, সেরূপ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সত্যে সাক্ষ্য দেবে। বহির্জগতের সত্যের অবিকল প্রতিকৃতি অন্তর্জগতে থাকা চাই, আবার অন্তর্জগতের সত্যের প্রমাণও বহির্জগতে পাওয়া চাই।'

সুতরাং ভারতবর্ষের ঋষি ও চিন্তানায়কদের মতে—আমাদের সামনে এই জড়জগৎ ও মানুষের সমাজজীবন যার দ্বারা সে পরিবেষ্টিত ; উভয়কেই আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তন্ন তন্ন করে দেখব। কিন্তু সেইসঙ্গে মানুষের চেতনা, চিন্তা, তার অহং—যেগুলি তার স্বভাবকে, তার চরিত্রকে প্রভাবিত করে সেগুলিও অনুসন্ধান করে দেখব। এই পথেও বহু তথ্য পড়ে রয়েছে, যা অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে এই অনুসন্ধান মানুষের বহির্জগতের অনুসন্ধানকেও সমৃদ্ধ করে। গাণিতিক জ্যোতির্বিদ স্বর্গীয় স্যার আর্থার এডিংটনের ভাষায় : (Philosophy of Physical Science, p. 5)

'আমরা এইটুকু আবিষ্কার করতে পেরেছি যে, যে জ্ঞান আমরা খুঁজে চলেছি তার স্বরূপটিকে বোঝার জন্যে এই অনুসন্ধানের কাজই একটি উপায়।'

৯ উপনিষদ্ ও ভারতের যুক্তিবিচারের পথ

ঔপনিষদিক যুগ থেকে ভারতবর্ষের ধর্মসাধনা চিরকালই মানুষের নিজেকে খোঁজার দুঃসাহসিক অভিযান, সমগ্র অস্তিত্বের গুপ্ত অর্থকে খুঁজে বের করার এক প্রাণান্তকর প্রয়াস। ভারতে অন্তত 'বিশ্বাস' কথাটির অর্থ কোন এক সুখকর বিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা নয়, বরং আধ্যাত্মিক অনুভূতির পথে এগিয়ে যাবার জ্বলন্ত প্রেরণা। এগিয়ে চলার আকুতি যদি না থাকে, সংগ্রাম যদি অনুপস্থিত হয়, তবে বিশ্বাসীর বিশ্বাস ও বিশ্বাসহীনের অবিশ্বাসে কোন তফাত থাকে না। তাই অনেকসময়

অধিকাংশ লোকের 'বিশ্বাস' একটা মানসিক আলস্য ছাড়া আর কিছুই নয়। এইসব মানুষের ধর্মনিষ্ঠাকে যখন উগ্র পুরোহিততন্ত্র ও সেই তন্ত্রে মত্ত কোন রাজশক্তি সংগঠিত করে তোলে, তখন 'জেহাদ', 'ক্রুসেড' বা এই জাতীয় উগ্র ধর্মান্তরিতকরণের প্রকাশ আমরা দেখতে পাই। অন্তরের আধ্যাত্মিক আকৃতির প্রয়োজনীয়তা এরা বোঝে না। প্রকৃত ধার্মিকের অন্তরের অতৃপ্তি এইসব মতবাদের গোঁড়ামি ও ধর্মান্ধ ক্ষিপ্ততা দিয়ে মেটানো যায় না। এর জন্য চাই আধ্যাত্মিক অনুভূতি। ধর্ম কথার অর্থ কিছু মতবাদে বিশ্বাস করে থাকা বা তার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া নয়। ধর্ম হলো অন্তরের অনুভূতি, আধ্যাত্মিক সত্যের উপলব্ধি।

উপনিষদের এই ঐতিহ্য ভারতবর্ষকে ধর্মীয় মতবাদের গোঁড়ামি থেকে মুক্ত রেখেছে। ধর্মবিশ্বাসীদের সংগঠিত করে সেই মতবাদকেই সবার ওপর কর্তৃত্ব করতে দেওয়া, এটি ভারতবর্ষে হতে পারে নি। কোন দেশেই এই কর্তৃত্ব বেড়ে উঠতে পারে না যদি ধর্মকে একটি অন্ধ বিশ্বাস নয়, বরং সত্যের অনুসন্ধানরূপে দেখা হয়। মতবাদের গোঁড়ামি বা সম্প্রদায়গত গোঁড়ামি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ধর্মকে যদি প্রকৃত আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকে দেখি তখন ধর্ম যে শুধু আত্মিক রাজ্যের অনুসন্ধান ও এক উদার দৃষ্টি এনে দেবে তা নয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই চারিত্রিক গুণগুলির প্রভাব পড়বে। ভগবদ্গীতা (৬/৪৪)-তে শ্রীকৃষ্ণ নিঃশব্দে ঘোষণা করছেন, আধ্যাত্মিক পথের যিনি অভিযাত্রী তিনি এমন অবস্থায় পৌঁছতে পারেন যা শাস্ত্রবাক্যের ও প্রচলিত ধর্মমতের উর্ধ্বে।

তিনি নিজেই একজন গবেষক ও আবিষ্কারক হয়ে ওঠেন, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসী মাত্র নয়। তাই ভারতে ধর্মচিন্তায় এই গবেষণা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। একেই বলা হয় 'সাধনা', এর মূল উৎস 'জিজ্ঞাসা'য় বা অনুসন্ধানে। সর্বব্যাপী ব্রহ্মের অনুসন্ধানকে বলি

'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এবং সামাজিক নীতিবোধ ও ব্যক্তির মূল্যবোধের অনুসন্ধানকে বলা হয় 'ধর্মজিজ্ঞাসা'।

মানুষের মননের জগৎকে সমন্বিত করে দেখার এক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এসেছে এই উদারতা। ভারত এটি নিয়েছে উপনিষদ্ থেকে। পরে সে তাকে আত্মস্থ করে নিয়েছে নিজের মননে ও বিচারধারায়। এর ফলেই তার পক্ষে সমস্ত ধর্মমতকে ও জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত শাখা ও প্রশাখাকে শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব হয়েছে।

১০ *'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্'*— (বিদ্যা বিনয়ী করে)

আধুনিক যুগে বিজ্ঞান মানুষের বৌদ্ধিক ক্ষমতাকে বহুগুণ বাড়াতে সক্ষম হয়েছে। এর ফলে অজানা রহস্যের ওপরও পড়েছে জ্ঞানের আলোক ও উপনিষদ্ যে পরা বিদ্যার কথা বলেছিল, তার প্রয়োজনীয়তাও মানুষ উপলব্ধি করছে। জে. আর্থার টমসনের ভাষায় ঃ (Introduction to Science, Home University Library Edition, 1934, p. 205)

'বৌদ্ধিক সীমা যখন প্রায় অতিক্রান্ত, মানুষ তখনও ধর্মের পথে হাঁটা বন্ধ করে নি।'

তাই গত কয়েক যুগে বেশ কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের দেখা পাই, যাঁরা বিজ্ঞানের আঙিনা অতিক্রম করে অজানাকে আরও কাছ থেকে জানার আগ্রহে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁদের বিনম্র, শ্রদ্ধাশীল পদক্ষেপ ভারতীয় প্রজ্ঞার একটি বাণী স্মরণ করিয়ে দেয় ঃ *'বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্'*, আর মনে করিয়ে দেয় কবি কোলরিজের বক্তব্য যেটি জে. আর্থার. টমসন উদ্ধৃত করেছেন ঃ (Ibid, p. 208)

'জ্ঞানার্জন শুরু হয় ও শেষ হয় বিস্ময় দিয়ে ; প্রথম বিস্ময় শিশুসুলভ অজ্ঞানতা থেকে আর দ্বিতীয় বিস্ময় শ্রদ্ধাবিনম্র পদক্ষেপে।'

মতবাদের গোঁড়ামি ও আমূল প্রোথিত সংকীর্ণতা এই স্বাধীন

অনুসন্ধানের পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাই এগুলি প্রকৃত ধর্ম বা প্রকৃত বিজ্ঞান, উভয়েরই শত্রু, জ্ঞানের অগ্রগতি ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের পথে না গিয়ে যাঁরা এই যুগে সংকীর্ণতার বেড়াজালে নিজেদের আবদ্ধ করছেন, তাঁরা যুগের উপযুক্ত নন।

এইভাবেই অতীতে ধর্মজগতে বিপদ দেখা দিয়েছে আর এখন সেই বিপদের ছায়াপাত ঘটছে বিজ্ঞানের জগতেও। স্বাধীন ও মুক্ত অনুসন্ধানের মনোভাব এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও তার মহান লক্ষ্যের দিকে যদি আমাদের শ্রদ্ধা অটুট থাকে, তবেই এইসব বিপদ থেকে আমরা মুক্ত থাকব।

ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল বিজ্ঞান ও ধর্মের বিবাদ-বিসংবাদে পূর্ণ এক শতাব্দী। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে দেখছি, উভয়েই উভয়কে বোঝার চেষ্টা করছে ও মিলনের পথ প্রশস্ত করছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সংকীর্ণ নিশ্চিন্ততা থেকে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের এই শ্রদ্ধাবিনম্র অনুসন্ধান নিঃসন্দেহে এক প্রার্থিত পদক্ষেপ। এরা বুঝতে পেরেছেন, যে স্বাধীন অনুসন্ধিৎসা থেকে বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রার শুরু, সেই অনুসন্ধিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ছেড়ে অনেক নতুন নতুন ক্ষেত্রে আজ বিস্তৃত। ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ঊর্ধ্বে এই অনুসন্ধানকে চালিয়ে যেতে পারলে তবেই একটি গবেষণা বিজ্ঞানসম্মত হয়ে উঠতে পারে। সেখানে এই দৃষ্টিভঙ্গি-ই বড়, বিষয় নির্বাচন নয়।

ধর্ম যে অন্তর্জগতের অনুসন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে, সেইটিকেও আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হিসেবে বুঝতে পারব যদি আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মহৎ লক্ষ্যের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ রাখি।

আর এই হলো ধর্মের প্রতি আমাদের ভারতীয় মনোভাব। আর ঠিক এই দৃষ্টির অভাবে পাশ্চাত্যে ধর্ম দুর্বল হয়ে পড়েছে ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারের সামনে দাঁড়াতে না পেরে আত্মগোপন করেছে।

১১ ভৌতবিজ্ঞানের সীমা

আমরা যখন ক্রমশ ভৌতবিজ্ঞানের গবেষণাকে আরও গভীর, আরও ব্যাপক করে তুলি, তখন এর সীমারেখাটিও আমরা বুঝতে পারি। ধরা যাক দুটি বিষয়ের কথা, একটি পদার্থবিদ্যা যার মধ্যে আমি জ্যোতির্বিদ্যাও ধরে নিচ্ছি, আর অপরটি জীবনবিজ্ঞান যার সঙ্গে ব্যবহারিক মনস্তত্ত্বও ধরে নিচ্ছি। এই দুটি বিষয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও মানুষ সম্পর্কে জ্ঞানরাশির এক মহাসমুদ্র উপস্থিত করেছে আমাদের সামনে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে দেখছি, পদার্থবিদ্যা কতকগুলি আবিষ্কারকে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত বলেই একরকম ধরে নিয়েছে।

তখন জড়বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিই ছিল শেষ কথা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এক শ্রদ্ধাবিনম্র পদক্ষেপ লক্ষণীয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে জড় বিজ্ঞানের গবেষণাগুলি এত গভীরে প্রবেশ করে নি। ক্রমশ তেজষ্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কার, পরমাণুর নিউক্লিয়াসের আভ্যন্তরীণ গঠনের আবিষ্কার মানুষকে এক নতুন উপলব্ধির জগতে নিয়ে এল। সে দেখল, তার বহির্বিশ্বের জ্ঞান এখনও কত সীমাবদ্ধ। তাই আজকের বিজ্ঞান সবিনয়ে স্বীকার করে সে বস্তুজগতের নানা রূপভেদ নিয়েই কাজ করে চলেছে, তার পেছনের সত্যতা নিয়ে নয়। আধুনিক যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ্ অকপটে আমাদের জানাচ্ছেন যে, বিজ্ঞানের গবেষণা ও আবিষ্কার এখনও বস্তুজগতের বহির্বিকাশ নিয়েই। এই দৃশ্যমান জগতের পেছনে রয়েছে একটি অদৃষ্ট জগৎ ও স্রষ্টা নিজে। বিজ্ঞানের এই সীমারেখা আজ বৈজ্ঞানিকদেরই স্বীকারোক্তি। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় প্রত্যক্ষভাবে বা যন্ত্রপাতির সাহায্যে যখন ধরা পড়ছে তখন তাকে নিয়েই বিজ্ঞানের কাজ। কিন্তু ধরা পড়ে কতটুকু? ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা কতটুকু জানতে পারি? যেটুকু জানতে পারি, তাতে এটুকু অন্তত বুঝতে পারি, এই দৃশ্যমান জগতের পেছনে একটি শক্তি তাকে নিয়ন্ত্রণ করে

চলেছে। আমাদের বিজ্ঞান তা নিয়ে নয়, আমাদের বিজ্ঞান যা দৃশ্যমান ও প্রত্যক্ষ তাকে নিয়ে এবং মানুষের প্রয়োজনে তাকে কাজে লাগাতেই সে ব্যস্ত।

জীবনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও একই ছবি। গত শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি এমনভাবে উচ্চারিত হয়েছিল যেন সেগুলিই শেষ কথা। সৃষ্টির ক্রমবিকাশতত্ত্ব (Theory of Evolution) আবিষ্কৃত হলো এর সঙ্গে পদার্থবিদ্যার সদ্য-আবিষ্কৃত সূত্রগুলি মিলিয়ে যে জড়বাদী চিন্তার সূত্রপাত ঘটল তাতে মানুষ, পশু ও মেশিনের তফাৎ রইল না। চার্লস ডারউইন তাঁর ক্রমবিকাশতত্ত্ব লিখতে গিয়ে বই দুটির নাম দিয়েছিলেন—জীবজগতের উৎপত্তি (The Origin of Species) ও মানুষের অবতরণ (The Descent of Man)।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা ঐ দুটি বই-এর নামকরণে খুশি নন। স্যার জুলিয়ান হাক্সলির মতে ঐ দুটি নাম হওয়া উচিত ছিল—জীবজগতের ক্রমবিকাশ (The Evolution of Organisms) ও মানুষের আরোহণ-পথ (The Ascent of Man) —(The Evolution after Darwin, Vol. I, The University of Chicago Press, p. 17)

ডারউইনের বই দুটির প্রকাশ ও নামকরণের পেছনে আর একটি ঐতিহাসিক কারণও ছিল, ঠিক সে-সময় সদ্য-আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির সঙ্গে খ্রীস্টান ধর্মের অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক চিন্তাভাবনার তীব্র সংঘর্ষ চলছিল। অলৌকিক শক্তির অধিকারি ঈশ্বরের বিশেষ এক সৃষ্টি হলো মানুষ—এ ধারণা আর টিকে থাকতে পারল না। ইউরোপে জড় বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলি ও জীবজগতের ক্রমবিকাশের তত্ত্ব ইত্যাদি মানুষের ধর্মবিশ্বাসের ভিতকে দিল নাড়িয়ে, কারণ সেগুলি অবৈজ্ঞানিক ও অতিপ্রাকৃত। 'ভৌতবিজ্ঞানের সীমারেখা' বলতে আধুনিক বিজ্ঞানের ঐ 'ভৌত' কথাটিতেই আপত্তি, নচেৎ বিজ্ঞানকে তো সত্যিই

সীমাবদ্ধ ভাবা যায় না। সত্যের অনুসন্ধান অসীম কিন্তু সীমাবদ্ধতা এসে পড়ে যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যের ওপরই কোন গবেষক পুরোপুরি নির্ভর করেন। এই সীমাবদ্ধতার কথা বলতে গিয়ে গাণিতিক-জ্যোতির্বিদ স্বর্গীয় স্যার আর্থার এডিংটন থেকে উদ্ধৃত করা যায় ঃ (The Philosophy of Physical Science, p. 16)

"মনে করা যাক, এক মৎস্যজাতীয় জীবকুলের গবেষক সমুদ্রের অভ্যন্তরে জীবনের সন্ধানে ব্যস্ত। তিনি এক জাল ফেলে নানা জাতের কিছু জীব জালে পেলেন। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে তিনি সংগৃহীত প্রাণীগুলির শ্রেণীবিভাগ করলেন ও মনে করা যাক, দুটি সিদ্ধান্তে এলেন ঃ

ক) কোন সামুদ্রিক প্রাণী দৈর্ঘ্যে দু-ইঞ্চির কম নয়।

খ) সব সামুদ্রিক প্রাণীর কানকো আছে।

তিনি যা পেয়েছেন, সেই তথ্যগুলি থেকে তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল। বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেও এই পথে ঐ সিদ্ধান্তই উঠে আসবে। কিন্তু অন্য এক শ্রেণীবিভাগ থেকে ঐ একই সিদ্ধান্ত তো আসতে পারে না।"

ঐ বইটির ভূমিকায় স্যার এডিংটন লিখলেন ঃ

"সত্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে কেউ যদি ভাবেন, শুধুমাত্র ভৌতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের অভিজ্ঞতাগুলিই বিবেচনা করলে চলবে, অন্যান্য ক্ষেত্রে নয়—তাহলে আমি তাঁদের মধ্যে নই। মানুষের যে বিশাল অভিজ্ঞতা তার দার্শনিক চিন্তা ভাবনা নিয়ে, সেই দার্শনিক চিন্তা ও ভৌতবিজ্ঞানের চিন্তা, উভয়ের মধ্যে আমি কোন অমিল খুঁজে পাই না, যদিও ভৌতবিজ্ঞানের চিন্তা ভাবনা যে সূত্রগুলি থেকে উদ্ভূত তার স্থায়িত্ব এখনও অনেকটাই অপরীক্ষিত।"

১২ জড়বাদী চিন্তার অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ

এতক্ষণ আমরা যে সীমাবদ্ধতার কথা বললাম, সেটা কোন বৈজ্ঞানিক যখন অগ্রাহ্য করে এবং জীবন সম্পর্কে, বাস্তবতা সম্পর্কে শেষ কথাটি

বলতে উদ্যত হয়, তখনই আসে মতবাদের গোঁড়ামি। সত্যের অনুসন্ধান তখন বন্ধ হয়ে যায়। এরই নাম জড়বাদী চিন্তা, যার সম্পর্কে, খ্যাতনামা 'বৈজ্ঞানিকেরা আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। টমাস্ হাক্সলি (Methods & Results, Vol I, p. 161) এই জড়বাদী চিন্তাকে অনুপ্রবেশকারী আখ্যা দিতে দ্বিধা করেন নি এবং স্থূল জড়বাদকে পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন।

'প্রকৃতিকে অধ্যয়ন করতে গিয়ে যে সব প্রতীক ও চিহ্ন আমরা বিজ্ঞানে ব্যবহার করি, তা অনেকসময় অকারণে বদল করি, ক্ষতি না হলে এই অকারণ পরিবর্তন অপ্রয়োজনীয়।...অঙ্কে অনেকসময় একই চিহ্ন যথা x এবং y ইত্যাদিতে অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ অযথা নিজেকে আটকে রাখলেও খুব একটা বাস্তব ক্ষতি হয় না, কিন্তু ভৌত এবং প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে সব দার্শনিক ভাবনা জলাঞ্জলি দিয়ে বিজ্ঞান যদি পূর্বনির্দিষ্ট চিহ্ন ও প্রতীকের মধ্যে ঘুরতে থাকে, তাহলে ঐ জড়বাদী শৃঙ্খল জীবনের সমস্ত সৌন্দর্যকে বিধ্বস্ত করে, সব শক্তির প্রবাহকে আবদ্ধ করে।'

১৩ ভৌতবিজ্ঞান ও বিশ্বের রহস্যসম্ভার

আদিম যুগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মানুষের কাছে ছিল রহস্যময়—যা আজ আর ততটা নেই, বিশেষত বিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষদের সামনে। অন্যদিকে স্যার জেম্‌স জিনস্-এর মতো বৈজ্ঞানিকেরাও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বৈজ্ঞানিক রূপ উন্মোচন করতে গিয়ে বই-এর নামকরণ করেছেন—'রহস্যময় এই বিশ্ব' (The Mysterious Universe)। এত সব মূল্যবান বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়ে গেল, কিন্তু আজও বিজ্ঞানের সামনে বিশ্ব রহস্যময়। বিশ্বের সমস্যার বাইরের দিকটুকুই বিজ্ঞানের দেখাশোনার জগৎ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তো অনেক দূরের কথা। তাই আমাদের মন থেকে যে প্রশ্ন উঠে আসে শঙ্করাচার্যের ভাষায় ঃ

'ততঃ কিম্ ততঃ কিম্'—'তারপরে কি?'

স্যার জেম্‌স জিনস্‌ তাঁর ('The New Background of Science' p. 68) বইতে এই প্রসঙ্গে সুন্দরভাবে বলেছেন ঃ

'ভৌতবিজ্ঞানের গবেষণা শুরু হয়েছিল বস্তুজগতের ও বিকীর্ণ শক্তির অনুসন্ধানে, কিন্তু কোনটারই একটা পুরো ছবি উঠে এল না। বীজগণিত শিখতে গিয়ে যেমন শিশু x, y, z ইত্যাদি নিয়ে নাড়াচাড়া করে, পদার্থবিদের কাছে তেমনি ফোটন, ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি শব্দগুলি। আমরা যেটা সব থেকে ভালভাবে করি তা হলো ঐ x, y, z ইত্যাদির একটু বুদ্ধিযুক্ত ব্যবহার। তাই আইনস্টাইনের ভাষায় জ্ঞানের অগ্রগতি হলো এক বোধাতীত অবস্থা থেকে আর এক বোধাতীত অবস্থায় যাওয়া।'

১৪ ভৌতবিজ্ঞান ও রহস্যাবৃত মানুষ

বহির্জগতের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে মানুষ আর একটি বড় রহস্যের সামনে উপস্থিত হয়েছে, সেটা সে নিজেই। মানুষের যে বহিরাকৃতি তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেমে থাকে নি, এগিয়েছে জীববিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও আরও সূক্ষ্মতর গবেষণার পথ ধরে। কিন্তু এই পথ মানুষকে এক রহস্যাবৃত গভীরতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে যখন মানুষ এক নতুন বৈশিষ্ট্যের যেন আভাস পেয়েছে—যা হলো এই বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্সত্তা।

এই বৈশিষ্ট্যকে মানুষ তার বস্তুজগতের জ্ঞান দিয়ে পরিমাপ করতে পারছে না।

এই বৈশিষ্ট্য তার নিজের নয় অথচ তার শরীর-মনের খাঁচাতেই তার অবস্থান। বিশাল বস্তুজগতের পরিপ্রেক্ষিতে এ যেন ধূলিকণার চেয়েও তুচ্ছ অথচ এই সত্তার পরিমাপ যেন অতীন্দ্রিয়, যাকে এত তুচ্ছজ্ঞান সে করতে পারে না। এই তার অন্তরাত্মা যার অবস্থান তার অস্তিত্বের গভীরে। তাই বিজ্ঞানকে যদি ক্রমশ এগিয়ে যেতে হয়, বহির্জগতের

পাশাপাশি তাকে মানুষের অন্তর্জগতের সন্ধানও করে যেতে হবে। এটি একটি সুবিশাল অনুসন্ধানের ক্ষেত্র যেখানে মানুষ নিজেই নিজেকে আবিষ্কার করবে, খুঁজবে তার চেতনাকে, তার অহংবোধ ও তার সত্তাকে। বহির্জগতের তুলনায় এই অনুসন্ধান আরও আকর্ষণীয়, আরও আনন্দদায়ক—তাই ইতোমধ্যেই পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিকেরা এই রহস্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। আমেরিকান বৈজ্ঞানিক অ্যালেক্সিস্ ক্যাবেলের কথায় এই অনুসন্ধান 'অজানা মানুষ'-এর খোঁজে যেখানে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে 'জানা মানুষ'-কে নিয়ে।

১৫ পদার্থবিদ্যা ও রহস্যাবৃত মানুষ

আজকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা—এর নির্মাতা মানুষ ; আবার এর ধ্বংসের চাবিও মানুষেরই হাতে। কিন্তু মানুষ নিজেই রহস্যাবৃত। আধুনিক বিজ্ঞানচিন্তায় আইনস্টাইনের অবদান সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে লিঙ্কন বার্ণেট লিখছেন ঃ (The Universe and Dr. Einstein, Mentor Edition, pp. 126-27)

"বিজ্ঞানচিন্তার অগ্রগতি যত ঘটেছে, ততই এটা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, জীবজগতের প্রত্যেকটি রহস্য ক্রমাগত আরও নতুন রহস্যের সন্ধান দিয়ে চলেছে। তাত্ত্বিক বিচার ও গবেষণার বিচিত্র পথে মানুষের অগ্রগতি, কিন্তু এ-সব পথের শেষে দেখতে পাই এক অতল গহ্বর যাকে কোন ভাবেই মানুষের প্রতিভা অতিক্রম করতে পারে না। এর কারণ সম্ভবত মানুষের জাগতিক সীমাবদ্ধতা, যা তাকে বারবার শৃঙ্খলিত করেছে। যতই সে এগিয়ে চলে, ততই বুঝতে পারে—'এই জীবননাট্যে আমরা শুধু দর্শক নই, অভিনেতাও।' (বৈজ্ঞানিক নীল্‌স বোর) মানুষ নিজের কাছেই নিজে সবচেয়ে বড় রহস্য। এই বিশাল রহস্যাবৃত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সে নিক্ষিপ্ত, কিন্তু কেন তা সে জানে না।

চারিদিকের এই বিচিত্র জগৎ ও তার ভেতরে নানা জৈবিক প্রক্রিয়া— তার কতটুকুই বা সে তার বুদ্ধি দিয়ে ও কল্পনা দিয়ে বুঝে উঠতে পারে! তার চেয়েও বড় কথা হলো, এই সমগ্র ক্রিয়াকাণ্ডে নিজের ভূমিকা থেকে নিজেকে বিশ্লিষ্ট করে দেখবার ও তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার যে এক মহত্তর ক্ষমতা তার আছে সেই রহস্যময় ক্ষমতার কতটুকু সে উপলব্ধি করতে পারে!”

অথবা মরমী ও গাণিতিক প্যাস্কালের কথায় ঃ

‘মহাবিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে আমি তো ধূলিকণারও অংশমাত্র। কিন্তু চিন্তায়? তার মাধ্যমে বিশ্বের উপলব্ধি আমার মধ্যে।’

১৬ জীববিদ্যা ও মানবরহস্য

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষকে বিচার করতে গিয়ে প্রখ্যাত জীবাশ্ম বিজ্ঞানী স্বর্গীয় পেরী টেলিহার্ড দ্য চার্ডিন বললেন ঃ (The Phenomenon of Man, Collins, London, 1959, pp. 35-36)

“নৃতত্ত্ববিদ বা এই জাতীয় গবেষকদের সীমাবদ্ধ দৃষ্টিতে মানুষ একটি অতিক্ষুদ্র সংকোচনশীল প্রাণীমাত্র। তার সোচ্চার ব্যক্তিত্ব সেই ভূমা থেকে আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে দেয়, যে ভূমার মধ্যে তার নিত্য অবস্থান। তার মধ্যে যে এক অসীম দিগন্ত, যে গভীরভাবে সে বৃহতের মধ্যে সম্পর্কিত, এই প্রাকৃতিক সত্যটি আমরা সহজেই তার দিকে তাকিয়ে ভুলে বসি। নৃতত্ত্বের সংজ্ঞায় মানুষকে সীমাবদ্ধ করা ঠিক নয় কিন্তু সেটাই আমরা করে বসি। আর সেইজন্যই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পথে শরীর ছাড়া পূর্ণাঙ্গ মানুষকে কখনও গবেষণার বিষয় করা হয় না।

“অতএব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও তার ঘটনাবলীকে প্রত্যক্ষবাদীর দৃষ্টিতেও যদি বিচার করি, তাহলেও বস্তুপুঞ্জের বহির্সত্তার পাশাপাশি আজ তার অন্তর্সত্তা,

বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে মন, এইগুলিও অনুসন্ধানের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। পদার্থবিদ্যাকে আমি সেইদিন সার্থক বলব যেদিন মানুষের সামগ্রিক সত্তাকে সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সে দেখতে সমর্থ হবে।"

ভারতবর্ষের উপনিষদ্ এই অসীম, অনন্ত মানুষকে আবিষ্কার করেছে আবরণে ঢাকা সীমাবদ্ধ মানুষের মাঝখানে। সীমাবদ্ধতায় তার জন্ম, এই সসীম জগতের অগণিত পরিবর্তন তার চারিদিকে, কাজেই সে এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধূলিকণারও অংশমাত্র, অথচ প্যাস্কালের ঐ সুন্দর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অসীমের অনুভূতি তার অন্তরে। তার অন্তরাত্মা অমর, তাই সে ইন্দ্রিয়ের পরপারে অনন্ত পথের অভিযাত্রী। মানুষের অন্তরের এই বৈশিষ্ট্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই বৈশিষ্ট্য আধুনিক বিজ্ঞানচিন্তায় ক্রমশ আজ প্রকাশের অপেক্ষায়।

প্রশ্ন উঠেছে, 'আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানের গবেষণা কি জগতকে বাইরের থেকে না দেখে অন্য কোনভাবে আদৌ দেখেছে?' চার্ডিন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ (তদেব, পৃঃ ৫৫)

"আজ পর্যন্ত একজন পদার্থবিদের চোখে কোন বস্তুর অস্তিত্ব হলো তার বহিরাকৃতি অথবা বাইরের থেকে তার বিশ্লেষণের ফল ; এর বাইরে কোন অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাসী নন। যিনি জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন, তিনিও তাঁর গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যান এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ নিয়ে রসায়নের গবেষণা ; জীবাণুগুলিকেও সেই দৃষ্টিতে দেখেই কাজ চলে। কিন্তু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। আবার কীটপতঙ্গ ও বহুকোষী জীবের ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে ব্যাপারটা তো জুয়াখেলার মতো অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়ায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে গবেষণার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্রমশ এক ব্যর্থ চেষ্টা হয়ে দাঁড়ায়। শেষে মানুষে এসে এ কাজ তো একেবারেই অসম্ভব, কারণ মানুষের নিজস্ব সত্তার স্বাধীন অস্তিত্বকে তো আদৌ অগ্রাহ্য

করা যায় না। এর কারণ মানুষের নিজের মধ্যেই রয়েছে জ্ঞানের প্রত্যক্ষানুভূতির এক উৎস।"

এই সত্যকে আজকের পৃথিবী, এমনকি আধুনিক ভারতবর্ষেও, মানুষ তেমন করে জানে না। একেই জুলিয়ান হাক্সলি বলেছেন, 'মানুষের সম্ভাবনা-অনুসন্ধানের বিজ্ঞান।' এই সত্যের সাধনাই ভারতবর্ষ শুরু করেছে প্রাচীন সভ্যতার আদিপর্বে, যখন রচিত হয়েছে উপনিষদ্ ও গীতার মতো মহাগ্রন্থ। তারপর সেই সাধনা চলে এসেছে আধুনিক কাল পর্যন্ত, যখন তার নাম দিয়েছি আমরা 'অধ্যাত্ম-বিদ্যা'। বেদান্ত ও যোগাভ্যাসের সম্মেলনে এই বিদ্যা অভিব্যক্ত করেছে মানুষের অন্তর্সত্তার গভীরতাকে।

এই আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান স্পর্শ করেছে একাধারে মানুষের কর্মের জগৎ ও মানুষের ধ্যানের জগৎকে। ভারতের দর্শন বিজ্ঞানের এই দুটি শাখা, অর্থাৎ ভৌতবিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, এর মধ্যে কোন ভেদ করে নি। তার দৃষ্টিতে ব্যবহারিক জগতের মানুষ ও আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ একই। এই দৃষ্টিতে মানুষকে জানি ও চিনি, আজ যাকে জানি না বা চিনি না, উভয়েই একই রূপের মধ্যেই প্রতিভাত, কোন ভেদ নেই।

বৈজ্ঞানিক চার্ডিন তাই সিদ্ধান্ত টেনেছেন ঃ (তদেব, পৃঃ ৫৬)

"আমরা এ-কথা স্বীকার না করে পারি না যে, যখন নিজেদের দিকে তাকাই তখন একটা ফাটলের মধ্য দিয়ে এক অন্তর্সত্তার আভাস যেন চোখে পড়ে। এর থেকে আমরা ক্রমশ এই সিদ্ধান্তের দিকে এগোতে থাকি যে এই অন্তর্সত্তা (Interior) সর্বত্র প্রবিষ্ট হয়ে বসে আছে এবং তা অনাদিকাল থেকে। সুতরাং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট যা কিছু তার অভিব্যক্ত বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি একটা ভেতরের বৈশিষ্ট্যও আছে। স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকটি বস্তুর বহির্সত্তা ও অন্তর্সত্তা যেন একসঙ্গেই বিরাজ করছে একটি সর্বকালীন সত্যরূপে।"

আমার মনে হয়, আর দেরি না করে আমাদের সময় হয়েছে বিশেষত আমাদের শিক্ষকবৃন্দ ও ছাত্রসমাজের, এইদিকে গবেষণার আলো ফেলবার। প্রকৃতির বিচিত্র এক সৃষ্টি মানুষ, তার অন্তরের গভীরের অনুসন্ধান আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য। এই আত্মশক্তির উদ্বোধন মানুষ যদি না ঘটায়, ক্রমশ তাকে নির্ভর করতে হবে বাইরের নানা শক্তির কাছে। শারীরিক বা মানসিক ব্যাধি নিরাময়ের জন্যে এই বাইরের শক্তিগুলির ওপর নির্ভরতা আমরা বুঝি। কিন্তু জীবনবিজ্ঞানের উদাহরণ টেনে নিয়ে এই নির্ভরতাই যদি মানুষের একমাত্র উপায় হয়ে দাঁড়ায়, প্রাকৃত ও সামাজিক শক্তিগুলির ওপর নির্ভর করে সে যদি সব আধ্যাত্মিক শক্তিকে জলাঞ্জলি দিয়ে বসে, তবে মানুষের এই সমাজ আর পশুর সমাজে খুব একটা তফাত থাকে না। এই ভয়াবহ নির্ভরতার কথা তাই অনেক বৈজ্ঞানিক বলতে শুরু করেছেন, যেমন জি. রাৎরে টেলরের পুস্তকে (The Biological Time-Bomb) তিনি লিখছেন, এই পথে হাঁটতে থাকলে বিজ্ঞান আর 'বিজ্ঞান' থাকবে না, হয়ে উঠবে 'অপবিজ্ঞান'।

আমরা যতই আন্তর-অনুসন্ধান চালিয়ে যাব, যতই আমাদের ঐতিহ্যকে বোঝার চেষ্টা করব, ততই আমাদের নিজেদের যে জীবন-দর্শন সেই আলোকে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা, তার উদ্দেশ্য ও উপায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ভৌতবিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সমন্বয় যদি এইভাবে গড়ে ওঠে, সমগ্র মানবসভ্যতা আরও ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠবে। সে ঐশ্বর্য শুধু বাইরের সম্পদ নয়, আন্তর-সম্পদও বটে, শুধু পরিমাণে তার পরিমাপ নয়, গুণগতও বটে। প্রখ্যাত স্নায়ুতত্ত্ববিদ স্যার চার্লস সেরিংটনের মতে ঃ (Man On His Nature, Pelican Edition, p. 38)

"আজকের দিনে বহিঃপ্রকৃতি বিশাল ও ব্যাপক হয়ে আমাদের ওপরে পক্ষ বিস্তার করেছে, যা বোধ হয় কোনকালে এতটা ছিল না, একটা

যন্ত্রের মতো আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে যদিও এটাকে পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বলা যাবে না। তার কারণ এর মধ্যে মানুষের সত্তাটি ঢুকে বসে রয়েছে। এই যন্ত্র ঠিক আমাদের মানুষের তৈরি যন্ত্রের মতো নয়। এর সমগ্র শক্তিপ্রবাহের মধ্যে মানুষের আবেগ, ভালবাসা, আশা-নিরাশা, ভয় ইত্যাদিও নানাভাবে ক্রিয়াশীল।"

১৭ ক্রমবিকাশ—জৈবিক না মনোসামাজিক

১৯৫৯ সালে ডারউইনের বিখ্যাত 'জীবকুলের উৎস' বইটির শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছিল। সে উপলক্ষে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় 'ডারউইনের তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে ক্রমবিকাশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ'—এই বিষয়ে একটি আলোচনা-সভার আয়োজন করে। এই আলোচনা-চক্রের অন্তিম পর্বে প্রখ্যাত জীব-বিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলি এই ক্রমবিকাশের একটি আধ্যাত্মিক পথনির্দেশ ইঙ্গিত করেন ঃ (Evolution after Darwin, Vol III, pp. 251-52)

"মানুষের ক্রমবিকাশ এখন শারীরিক পরিবর্তনে নয়, মনের ও সেই সঙ্গে তার সমাজেরও। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে যে শক্তিগুলি উঠে আসে তার সাহায্যে মানুষ নিজেকে নতুন করে তৈরি করে, নিজের মানসিক ক্রিয়াগুলিকে প্রয়োজনমত নতুন করে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে অর্জিত জ্ঞানরাশি নতুন রূপে মানুষের মনে সংগঠিত হতে থাকে ও এইভাবেই ক্রমবিকাশের ধারা এগিয়ে চলে। তখন ভাবনা-চিন্তা ও জীবনাদর্শে নতুন পরিবর্তন উঠে আসতে থাকে, শারীরিক বা জৈবিক গঠনে নয়।

"মানুষের অস্তিত্বের চূড়ান্ত বা তাৎক্ষণিক কোন সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি চিন্তার জগৎ প্রসারিত হয়েছে মানুষের গভীরতম সমস্যার সমাধানে। অনন্ত-প্রসারিত কালের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ ভাবতে বসেছে—

সে কে, যে পৃথিবীতে সে থাকতে এসেছে তার স্বরূপটাই বা কি। অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বের বৈশিষ্ট্য ও তার ভবিষ্যৎ আধুনিক মানুষের চেতনাকে আজ অধিকার করেছে।"

হাক্সলি লক্ষ্য করলেন, মানুষের ক্ষেত্রে জীবের ক্রমবিকাশ এগিয়ে চলেছে তার গুণগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঃ (তদেব, পৃঃ ২৬১-৬২)

"আমরা (ক্রমবিকাশের দৃষ্টিতে) লক্ষ্য করছি যে, বস্তুকে শাসন করছে মন ও পরিমাণগত পরিবর্তনের ওপরে উঠে এসেছে গুণগত পরিবর্তন।"

তিনি লিখলেন, 'ডারউইনের তত্ত্বের নতুন রূপ' (Emergence of Darwinism)। তাঁর এই প্রবন্ধে ক্রমবিকাশের ধারাকে মানুষের আন্তর-সম্ভাবনার পরিপূর্তির মধ্যে এগিয়ে নিয়ে গেলেন ঃ (তদেব, ১ম পর্ব, পৃঃ ২০)

"আধুনিক জ্ঞানের আলোকে মানুষের জীবন শুধুমাত্র জৈবিক অস্তিত্ব, বংশবিস্তার অথবা শুধুমাত্র নতুন নতুন জটিলতর সংগঠন গড়ে চলা বা প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলা নয়। ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে মানুষের আন্তর-সম্ভাবনাগুলির উপলব্ধি ও সেইগুলির পরিপূরণের মধ্যে আজকের মানুষ নিজেকে বিকশিত করছে।"

তাই এই 'মানব-সম্ভাবনার বিজ্ঞানে'র উন্নয়ন কামনা করে হাক্সলি বলছেন ঃ (তদেব, ১ম পর্ব, পৃঃ ২১)

"এই আন্তর-সম্ভাবনাগুলির পরিপূরণের মধ্যেই যদি মানুষ তার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যটি খুঁজে পায়, তাহলে মনের পরিবর্তন ও সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সেজন্যে চাই এই নতুন বিজ্ঞান। মানুষের সম্ভাবনাগুলির অনুসন্ধান নিয়ে গড়ে উঠবে এই নতুন বিজ্ঞান, এক মনোসামাজিক ক্রমবিকাশ।"

১৮ মনোসামাজিক ক্রমবিকাশ

মনোসামাজিক ক্রমবিকাশের যে কথা আমরা বলছি, তার অর্থটা কি? এককোষী জীব থেকে মনুষ্যজাতি পর্যন্ত ক্রমবিকাশের ধারা চলে এসেছে জৈবিক অস্তিত্বের তাড়নায়, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি ও বংশবিস্তারের প্রয়োজনে। কিন্তু আধুনিক জীববিজ্ঞানীদের মতে মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রেরণাগুলি এখন হয়ে পড়েছে অপ্রধান। এখন প্রধান প্রেরণা লক্ষ্যের পরিপূরণ, তাই মানুষের ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশ লক্ষ্যের পরিপূরণের সচেতন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে, আদিম যুগের সেই প্রাকৃতিক শক্তিই অন্ধ আনুগত্যের মধ্য দিয়ে নয়। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনটি সম্ভব হয়েছে মানুষের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে বলে। ফলে ক্রমবিকাশের ধারাতেও ঘটেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। একসময় যা ছিল জৈবিক ক্রমবিকাশ, এখন তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে মনোসামাজিক ক্রমবিকাশ। মানুষের চিন্তা ও উদ্ভাবনী শক্তি যেভাবে বিকশিত হয়েছে, তার কাছে জৈবিক ক্রমবিকাশের আর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই—কারণ তার প্রয়োজনীয়তাগুলির জন্যে প্রকৃতি ঐ মন্থর ও মূল্যহীন পদ্ধতির অপেক্ষা না করে সে অনেক দ্রুত ও অনেক নতুন কৌশল উদ্ভাবন করে ফেলতে পেরেছে। তাই জীববিজ্ঞানীদের মতে ক্রমবিকাশ আর জৈবিক স্তরে নেই, উঠে এসেছে মনের যে সামাজিক ভূমিকা সেই স্তরে।

মানুষেরও আগে জীবসৃষ্টির সেই আদিযুগে যেমন দেখেছি ঠিক তেমনি আত্ম-কেন্দ্রিক মানুষের ক্ষেত্রে আজও মন ও হৃদয় সবসময়েই জৈবিক অস্তিত্বের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ। নীতিপরায়ণ মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সীমা বিস্তৃত হতে থাকে জৈবিক অস্তিত্বের গণ্ডি পেরিয়ে। ক্রমশ এই উন্নত মন প্রবেশ করে সামাজিক পরিমণ্ডলে, অথবা বলা যায় সামাজিক পরিমণ্ডল প্রবেশ করে তার মনের আঙিনায়। একেই মনোসামাজিক ক্রমবিকাশের ফলশ্রুতি বলা যায়। জীববিজ্ঞানীরা এই যাকে মনোসামাজিক

ক্রমবিকাশ বলছেন, একেই ধর্মবিজ্ঞান আধ্যাত্মিক বিকাশের আদিপর্বে মানুষের নৈতিক চেতনা, সমাজচেতনা ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করেছে।

মনোসামাজিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এখন পারস্পরিক প্রেম ও প্রীতিকে সচেতনভাবে উদ্বোধিত করতে শিখেছে, কোন জৈব তাড়নায় নয়। এটি নিঃসন্দেহে মানুষের ব্যক্তিত্বের উচ্চতর প্রকাশ। পৃথিবীর প্রত্যেকটি নীতিতত্ত্বই মানুষের ব্যক্তিত্বের অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্র অহংবোধ ও অন্য একটি উচ্চ অহংবোধ ও তাদের পার্থক্যের কথা বলে। ঐ উচ্চ অহংবোধের পরিব্যাপ্তি ঘটে মনোসামাজিক ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে বা আধ্যাত্মিক বিকাশের মাধ্যমে। একেই আমরা বলি 'কাঁচা আমি'-র সংকোচন ও 'পাকা আমি'-র পরিব্যাপ্তি।

আধুনিক মানুষের কাছে তাই এই মনোসামাজিক ক্রমবিকাশ, এই আধ্যাত্মিক বিকাশ এত গুরুত্বপূর্ণ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এই বস্তুজগতের দাসত্ব থেকে মানুষ মুক্তি চাইছে। ব্যক্তি বা সমষ্টি সবক্ষেত্রেই গুণগত প্রাচুর্যের মধ্যে মুক্ত হবে, মানুষের এই যে আকাঙ্ক্ষা এ একমাত্র ঐ আধ্যাত্মিক বিকাশের পথেই পূরণ হতে পারে।

সৃষ্টির ইতিহাসে মনুষ্যজাতির আবির্ভাবের পর থেকে এই অহংবোধের ধারণা ও তার বিকাশের দিকটি প্রাধান্য পেতে শুরু করেছে। এমনকি মানুষের ক্ষেত্রেও শিশু দুই থেকে আড়াই বৎসর যতদিন না অতিক্রম করে, এই ধারণা দানা বেঁধে ওঠে না। লক্ষণীয় যে ঐ বয়স পর্যন্ত মানবশিশুও মনুষ্যেতর প্রাণীদের মতো পরিবেশের ওপর পুরোমাত্রায় নির্ভরশীল ও অসহায়। তারপর থেকে সে ক্রমশ পরিবেশ ও প্রকৃতিকে শাসন করতে শেখে। চার-পাঁচ বৎসরে মানবশিশুও গরু, ঘোড়া ইত্যাদি জন্তুজানোয়ারকে শাসন করতে পারে, যেগুলি চেহারায় তার চেয়ে অনেক বড়। মানবশিশুর ব্যক্তিত্বের এই নতুন অভিমুখকে আধুনিক স্নায়ুতত্ত্ববিদেরা এক অভিনব ঘটনা নামে চিহ্নিত করেছেন। এর ফলে অহংবোধের এক উচ্চতর বিকাশ ঘটেছে

ও মানুষের ক্ষমতার বিকাশ ঘটেছে কল্পনাশক্তি, যুক্তিবিচার ও নতুন নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়ে। এই প্রসঙ্গে স্নায়ুতত্ত্ববিদ গ্রে ওয়াল্টারের লেখায় পাই ঃ (The Living Brain, p. 2)

"মস্তিষ্কের কাজ দেখলে লক্ষ্য করি যে মানুষ ও প্রাক্‌মনুষ্য জাতি অর্থাৎ বানরের মধ্যে শারীরবৃত্তীয় পার্থক্য যথেষ্ট বেশি। অন্তরাত্মার অস্তিত্ব যদি আলোর মতো মানুষের জীবনের উচ্চতর ও জটিলতর প্রশ্নগুলির সমাধান খুঁজে দিতে থাকে, মনুষ্যেতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল আলোর পরিবর্তে সে যেন এক ক্ষীণ দীপশিখা। ক্রমবিকাশের ধারায় শিম্পাঞ্জি তো আমাদের খুব কাছের এক প্রাণী। সে অনেক কৌশল জানে, এমনকি আয়ত্তের বাইরে হলেও কৌশল করে খাদ্য সংগ্রহ করে আনে। সে কিন্তু মস্তিষ্কে কোন নতুন সংস্কার বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে না; যার ফলে নতুন কোন প্রবণতাও আবিষ্কার করতে পারে না। কোন উদ্দীপক কারণ যখন মস্তিষ্কে তরঙ্গ সৃষ্টি করে, সেই বিচিত্র তরঙ্গগুলি পরিকল্পনার অভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে পারে না, ফলে এইসব জীবজন্তুরা অনুভূতিগুলিকে সংযত করতে শেখে না। তাই প্রকৃতি ও পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে না, বরং তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেকগুলি উদ্দীপকের প্রভাব যখন জীবজন্তুর মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, সে তার মধ্যে সময় করে একটিকে বেছে নিতে পারে না—বরং তৎক্ষণাৎ একটাই প্রতিবর্ত ক্রিয়া বেরিয়ে আসে মাত্র। বানরের মস্তিষ্ক তার প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ানুভূতির কাছে দৃঢ়বদ্ধ। ঈষৎ মাতলামি ঢুকিয়ে দিলে বানরের প্রথম প্রতিক্রিয়াই হলো 'আমি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করি, কাজেই আমার অস্তিত্ব আছে', অন্যদিকে ঠিক একই প্রতিক্রিয়া দেখি মানুষের মধ্যে যখন সে চূড়ান্ত মাতাল। উভয় প্রতিক্রিয়া কতটাই না একরকমের, যদিও উৎস কত ভিন্ন।

"বাঘ, সিংহ, গণ্ডার ইত্যাদি শক্তিশালী প্রাণীর মস্তিষ্কে একটি জিনিসেরই অভাব, তা হলো তাদের কল্পনাশক্তি, আর আমাদের সেটা আছে বলেই

আমরা সেগুলো নিয়ে এখন আলোচনা করতে বসেছি। তারা তাদের পরিবেশের পরিবর্তনের কথা কল্পনাও করতে পারে না, তাই চেষ্টা করে তার উর্দ্ধে উঠে তাকে পরিবর্তন করার কথাও ভাবে না।"

মানুষই একমাত্র তার অভিজ্ঞতার স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি অন্তরপটে ধারণ করে রাখতে পারে এবং এই শক্তি তার জীবনে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়। ক্রমবিকাশের ধারায় যে দেহযন্ত্র মানুষ পেয়েছে তার মধ্যে প্রকৃতি অনেকগুলি নতুন পদ্ধতি শুরু করার ক্ষমতা প্রদান করেছে—যেমন পর্যবেক্ষণ, স্মৃতিশক্তি, তুলনামূলক বিচার, মূল্যায়ন, নির্বাচন, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও সচেতন কর্মপ্রয়াস। আজ এইগুলি লাভ করার পথে দুটি বিষয় তার কাছে এসে পৌঁছেছে।

এক, নতুন নতুন পথের আবিষ্কার—যে পথে জীবনের স্থূল অভিজ্ঞতা পরিবর্তিত হয়েছে জ্ঞানে, জ্ঞান পরিবর্তিত হয়েছে শক্তিতে, শক্তি নিয়ন্ত্রণক্ষমতায় ও নিয়ন্ত্রণক্ষমতা বিস্তৃত হয়েছে মানুষের চারিদিকের শত অভিজ্ঞতা-সিঞ্চিত এই প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর।

দুই, নিজের অহংবোধ সম্পর্কে এক অস্পষ্ট সচেতনতা যা হয়তো এই চলমান মনের পেছনের এক অচল অস্তিত্ব। সেইসঙ্গে অন্তরের গভীরে নতুন পথের আবিষ্কার যা হয়তো জীবনের বাস্তব সত্যগুলিকে হৃদয়ঙ্গম করতে সাহায্য করবে, জীবনের প্রত্যেকটি চিন্তা ও কাজের নৈতিক, নান্দনিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে মুক্তির পথে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এই দুইদিকে ঘটেছে মানবজাতির দৃঢ় অগ্রগতি, তার ফলেই সৃষ্ট হয়েছে সভ্যতা ও সংস্কৃতি, মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে ক্রমবিকাশের এই নতুন পথ। এই নতুন পথে মানুষের মন খুঁজে চলেছে কখনও আত্মবস্তু ; কখনও অনাত্মবস্তু নানান মাত্রায়। বিশ্বপ্রকৃতি তার দরজা খুলে দিচ্ছে দিনের পর দিন। আত্মচেতনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ক্রমবিকাশের এ এক নতুন অধ্যায়।

১৯ জ্ঞান থেকে প্রজ্ঞায়

আদিম মানুষ নিজেকে অল্পই চিনত। যেটুকু চিনত তা দিয়ে সে প্রাকৃতিক শক্তি ও চারিদিকের জন্তুজানোয়ারকে যতটা পারত শাসন করত, যদিও ক্ষুধাতৃষ্ণা ও আচরণ ছিল অনেকটা জন্তুজানোয়ারেরই মতো। ক্রমশ যতই সে নিজেকে সামাজিক অভিজ্ঞতার দর্পণে চিনতে শিখল, ততই সে নিজেকে সংযত করে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে লাগল। ক্রমশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটতে লাগল, গড়ে উঠল সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ও এল আধুনিক মানুষ। এই আধুনিক মানুষের অনেকটাই করায়ত্ত হয়েছে পরিবেশ ও প্রকৃতি, ব্যবহার করে চলেছে ফলিত বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য আবিষ্কারগুলি, বিশ্ব জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগসূত্র। মানুষ এখন বিশ্বনাগরিক, ব্রহ্মাণ্ডের অন্বেষণে তার অভিযাত্রা।

এসব সত্ত্বেও বহিঃপ্রকৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতি এই উভয়ের নিয়ন্ত্রণে মানুষের এক বৈষম্য কিন্তু উপস্থিত। তাই কারিগরি কলাকৌশল ও তার মনের গতিবিধির নিয়ন্ত্রণ এই দুটির পার্থক্য তার ক্রমবিকাশের ধারাকে এক সমস্যার সম্মুখীন করেছে।

এই সমস্যা তাকে পূর্ণতার পথে যেতে দিচ্ছে না। অন্যদিকে সমাধানের অভাবে এই সমস্যা মানুষের সভ্যতা, তার ক্রমবিকাশের ফলশ্রুতি সব কিছুকেই ধ্বংস করে দেবার ক্ষমতা রাখে। সেদিন মানুষই ধ্বংস করে দেবে শুধু সভ্যতা সংস্কৃতি নয় নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত। তাই সমাজে মানুষ এক সংকট থেকে তৈরি করছে নতুন সংকট, এক দুঃখ, এক অপ্রাপ্তি থেকে আবার নতুন দুঃখ, নতুন অপ্রাপ্তির বেদনা।

এর সমাধান নিহিত রয়েছে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সচেতনতা বৃদ্ধির পথে। জৈবিক ক্রমবিকাশ এই পথে যৎসামান্যই এগোতে পেরেছে কারণ আদিম মানুষের নিজের অহং নিয়ে ধারণা খুবই সীমিত। বুদ্ধি নিয়ে

এল মানব সভ্যতায় সামাজিক ক্রমবিকাশ। এই বিকাশ মানুষকে অনেকটা এগিয়ে দিল ; কারণ—জৈবিক অহংবোধ থেকে এক সামাজিক অহংবোধে মানুষের উত্তরণ ঘটে চলেছে। আধুনিক মানুষ নৈতিক দিক থেকে ক্রমশ বেশিসংখ্যক মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে উঠছে। মানুষের ক্রমবিকাশের এই ধারা মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে চাইছে ক্ষুদ্রস্বার্থ থেকে বৃহৎ স্বার্থে, জ্ঞান থেকে প্রজ্ঞায়। প্রজ্ঞার পথে উত্তরণ আজ কত প্রয়োজনীয়, তা উল্লেখ করে স্বর্গীয় বার্ট্রাণ্ড রাসেল বক্তব্য রাখলেন ঃ (The Impact of Science on Society, pp. 120-21)

"একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে আমরা চলেছি, একদিকে মানুষের দক্ষতা ও কৌশল, যা আমাদের উপায়, অন্যদিকে মানুষের নির্বুদ্ধিতা, যা আমাদের শেষ সীমা। শেষ সীমায় পৌঁছনোর জন্যে এতটাই আমাদের বুদ্ধিহীন প্রয়াস যে একটা করে মানুষের দক্ষতা বাড়তে থাকে, আর মানুষ নিজের ধ্বংসের দিকে এক ধাপ করে এগোয়। মনুষ্যজাতি আজ পর্যন্ত টিকে রয়েছে কারণ তার অজ্ঞতা আছে, দক্ষতার অভাবও আছে। কিন্তু পরিপূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ দক্ষতার সম্ভারের সঙ্গে নির্বুদ্ধিতা যুক্ত হয়ে থাকলে মানুষের এই পৃথিবীতে টিকে থাকা অসম্ভব। যে কোন জ্ঞানার্জন শক্তি এনে দেয়, কিন্তু সেই শক্তি কল্যাণের কাজে প্রযুক্ত হতে পারে অথবা বিনাশের ; কাজেই এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, মানুষ জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রজ্ঞাকে অর্জন করতে না পারে, তবে এই জ্ঞানরাশি তার দুঃখ, হতাশাকেই বাড়িয়ে তুলবে।"

জীববিজ্ঞানী ওয়াডিংটনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী জীববিজ্ঞান 'হোমোষ্ট্যাসিস'* এর কথা বলে, যার ফলে উচ্চস্তরের স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ভেতরের শারীরিক গঠন প্রকৃতির হাতে একটা স্থিতিশীল জায়গায় পৌঁছতে

---

*'হোমোষ্ট্যাসিস' হলো জীবদেহের সমস্ত অন্তর্যন্ত্রের কার্যপদ্ধতিগুলির সুষম সমন্বয়।

পেরেছে। সৃষ্টির আদিপর্ব থেকে প্রকৃতির হাতে মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে ক্রমবিকশিত হয়েছে, শেষে মানুষের ক্ষেত্রে এই বিকাশ একটা পূর্ণতালাভ করেছে। প্রত্যেকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে যে জৈবিক অস্তিত্বের তাড়না, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির ইচ্ছে ও বংশবিস্তারের আগ্রহ কাজ করেছে, মানুষের ক্ষেত্রে এইগুলি হয়ে গেছে তা মস্তিষ্কের নিচের স্তরের কাজ, ওপরের স্তর থেকে উঠে এসেছে যে কাজ তা তার 'হোমোষ্ট্যাসিস' এর সীমাকে অতিক্রম করেছে। এই হলো আধুনিক স্নায়ুতন্ত্রবিদদের মত। (The Living Brain, p. 16)। তাই আধুনিক মানুষের মস্তিষ্ক ক্রমবিকাশকে যে স্তরে নিয়ে যাচ্ছে, তাকে মনোসামাজিক বিকাশ বললে অত্যুক্তি হয় না। বেদান্তের ভাষায় এই বিকাশ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক।

২০ মনোসামাজিক ক্রমবিকাশ তথা আত্মিক উন্নয়ন

মস্তিষ্কের উচ্চস্তরের এই উচ্চচিন্তার কাজ করার ক্ষমতা ও দক্ষতা অনেকটা নির্ভর করে মানুষ তার মস্তিষ্কের নিম্নস্তরের পরাধীনতা থেকে নিজেকে কতটা মুক্ত করেছে, ইন্দ্রিয়বাসনার দাসত্ব থেকে নিজেকে কতটা স্বাধীন করতে পেরেছে। এটা স্বাভাবিক যে তার যুক্তিবিচার ও কল্পনাশক্তির ক্ষমতা, মস্তিষ্কের ঐ যে উচ্চস্তর তা নিয়ে সে একেবারেই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে যখন দেখে যে, সে তার মস্তিষ্কের নিম্নস্তরের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

এই বদ্ধদশা থেকে উদারতা ও উচ্চচিন্তার আকাশে মুক্তি মানুষের স্বভাব। মানুষের এই উদ্ধার ঘটে মন ও ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংযত আচরণের মধ্য দিয়ে, বেদান্ত যাকে 'শম' ও 'দম' নামে অভিহিত করেছিল। মানুষের সদসৎ-বিচার ও ইচ্ছাশক্তির এই হলো প্রকৃত রূপ, যাকে বেদান্ত 'বুদ্ধি' নামে চিহ্নিত করেছে। এই 'বুদ্ধি' মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ উপায় যার সাহায্যে জ্ঞান থেকে প্রজ্ঞায়, শৃঙ্খল থেকে মুক্তিতে মানুষের জয়যাত্রা।

এই 'হোমোষ্ট্যাসিস'-এর সীমা পেরিয়ে মস্তিষ্কের উচ্চস্তরে যখন মানুষের বিকাশ ঘটে, তখন সে বিকাশের সংজ্ঞা দিচ্ছেন অনুপম ভাষায় গ্রে ওয়াল্টার ঃ (তদেব, পৃঃ ১৮)

"প্রাণীজগতে বিশেষত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে 'হোমোষ্ট্যাসিস'-এর অর্থ টিকে থাকা, আর মানুষের ক্ষেত্রে এর অর্থ বন্ধন-মোচন"।

সুতরাং মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ একটি বাস্তব ঘটনা। এই বিকাশ সম্পর্কে, এর অন্তর্নিহিত বিজ্ঞান সম্পর্কে যত বেশি জানতে পারব, আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনের পক্ষে ততই মঙ্গল। এই যে 'বিকাশ' কথাটি, এর বৈশিষ্ট্য ক্রমপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। মনুষ্যজাতির বিকাশ বলতে আমরা দু-রকমের বিকাশ বুঝি, দৈহিক ও মানসিক। জন্মাবার সময় যে শিশুর দেহের ওজন ৭/৮ পাউণ্ডমাত্র, ক্রমশ মায়ের দুধ ও পরে নানারকমের খাদ্য, পানীয় খেয়ে ধীরে ধীরে সে যখন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে ওঠে, তখন তার দেহের ওজন ৭০/৮০ কিলোগ্রাম। এই শারীরিক বিকাশ আমাদের সহজবোধ্য, কিন্তু একইরকমভাবে গুরুত্বপূর্ণ তার মানসিক বিকাশ, যদিও তা কিছুটা অপ্রত্যক্ষ। শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুর সতর্কতা বাড়ে, আত্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-সম্ভ্রম জাগতে থাকে ও উঠে আসে একজন প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রতিষ্ঠান-বহির্ভূত শিক্ষার মাধ্যমে যে মানসিক পুষ্টি মানুষ পায়, সেই পুষ্টিই তার মানসিক বিকাশ ঘটায়.।

এই দুই ধরনের বিকাশ প্রয়োজনীয় কিন্তু এই দুটিই যথেষ্ট নয়। এছাড়া একটি তৃতীয় ধরনের বিকাশ আছে, যেটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অতটা জনপ্রিয় নয়। অথচ এই ধরনের বিকাশ ছাড়া মানুষের ব্যষ্টিজীবনে বা সমষ্টিজীবনে অন্য বিকাশগুলির পথ অবরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে, তার পূর্ণতালাভের তীব্র প্রয়াস পরাজয়ে শেষ হতে পারে। এটি তার আধ্যাত্মিক বিকাশ। এর আরম্ভ হয় নৈতিক সচেতনতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

থেকে ও (বেদান্তমতে) বিস্তৃত হয় ব্যক্তির স্বরূপ সন্ধানে যেখানে সে অনন্ত, বিশ্বব্যাপী, দৈবী এক সত্তা।

২১ ক্রমবিকাশে অহং-এর স্থান

যে অহং বা আমিত্ব মানুষকে প্রকৃতির রাজা করেছে, সেটাই একমাত্র তার প্রকৃত স্বরূপ নয়, এক মহত্তর সম্ভাবনার পূর্বাভাসমাত্র। বিশাল হিমশৈলের সামান্য অগ্রভাগটুকু থাকে জলের ওপরে—এ-ও তাই। ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবিদ্যা বা অন্তর্বিজ্ঞান ঘোষণা করে এই পরমাত্মার কথা যা সাধারণ মন ও বুদ্ধির অগোচর কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। গীতা তাই পরমাত্মাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়, এই বিশেষণে বিশেষিত করে। বৌদ্ধধর্মের সারকথায় তাই এই অহংত্ব বা আমিত্বকে অসত্য বলতে দ্বিধা করা হয় নি, একে মানুষের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে কোনভাবেই সম্পর্কিত করা হয় নি। আধুনিক জীববিজ্ঞানও এই সিদ্ধান্তকে মেলে দিয়েছে। এইচ. জি. ওয়েল্‌স, জি. পি. ওয়েল্‌স ও জুলিয়ান হাক্সলি আধুনিক জীববিদ্যার ওপর যে সুবৃহৎ সংকলনটি সম্পাদন করেছেন, তার 'জীববিদ্যায় দার্শনিক প্রভাব' অধ্যায়ে লিখছেন ঃ (The Science of Life, pp. 878-79)

'চিন্তার গভীরে রাত্রির পরম নিস্তব্ধতার মাঝে যখন আমরা সম্পূর্ণ একা, তখন এই প্রশ্ন কি দেখা দেয় না—এই 'আমি' যা বিশ্বব্যাপী কাজের মাঝখানটিতে, এই 'আমি' যা পৃথিবীর রঙ, রূপ ও রসের আস্বাদগ্রহণে, তার অধিকারে এত ব্যস্ত, সে 'আমি' নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব নিঃশেষে? এই 'আমি' কে বাদ দিলে জগৎ তো শূন্য হয়ে যায়। তবু সুষুপ্তির গভীরে আমরা এই 'আমি' কে খুঁজে পাই না। সে হয়তো তখন নিজের অস্তিত্বের গভীরে কোথায় লুক্কায়িত, কেমনভাবেই বা তার সেই গহ্বরে প্রবেশ, আমরা জানি না।

'আমিত্বকে ঘিরে মানুষের যে ব্যক্তিত্ব, এ-ও হয়তো প্রকৃতিরই একটি

কৌশল যা এই ভ্রমকে সৃষ্টি করে যার হয়তো সত্যিই একটা সাময়িক প্রয়োজনীয়তা আছে।

'যতই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণা মানুষের কাছে বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়ে উঠছে, ততই সে আর এই ব্যক্তির জীবন ও মৃত্যু এই সীমাটুকুর মধ্যে চিন্তার পরিধিকে ধরে রাখতে পারছে না।

'বৃহতের মধ্যে সে ছুটছে নিজের আমিত্বের গণ্ডি পেরিয়ে, পেয়েছে নৈর্ব্যক্তিক এক অমরত্বের আস্বাদ। এখানেই রয়েছে ধর্মের মূলসূত্র। লক্ষণীয়, জীববিদ্যার বিচার ও মরমী ধর্মসাধকদের বিচারধারার মধ্যে কত সাদৃশ্য।

'পাশ্চাত্যের মরমী সাধক ও প্রাচ্যের ঋষি—উভয়েই তাই আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে জীবনবোধে রঞ্জিত এক নীতিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। উভয়েই শিক্ষা দিচ্ছেন—'নিজেকে নিবেদন কর পরার্থে, পরকল্যাণে—তোমার অহং তোমার চলার পথের পাথেয় ও লক্ষ্য নয়।'

আধ্যাত্মিক বিকাশের এই যে পথ, এ পথ মানুষকে তার সাময়িকভাবে প্রয়োজনীয় একটা অহংবোধের ধারণা থেকে পরমাত্মার উপলব্ধির দিকে, তার প্রকৃত স্বরূপের দিকে নিয়ে গেছে। এই আধ্যাত্মিক বিকাশ এসেছে নীতিবোধ থেকে, নান্দনিকতা ও ধর্ম থেকে। এর ফলে মানুষ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, প্রার্থনাই করুক বা কাজ করুক, একাকী থাকুক বা সমাজের একজন হয়ে থাকুক একটা আধ্যাত্মিক পুষ্টি তাকে অনুসরণ করে। গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষা দিয়েছেন অপূর্ব ভাষায় (৮/৭) *'তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ'*—অতএব সর্বদা আমার অনুধ্যান কর ও যুদ্ধ কর। ত্যাগ ও সেবার ভাব নিয়ে যদি প্রত্যেকটি কাজ করা হয় ও তার পেছনে থাকে পূজা ও ধ্যানচিন্তা যা ভক্তি ও ভজনের দ্বারা লাভ করা যায়, তাহলে এই প্রয়াসযুগল মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশকে প্রশস্ত করে। গীতার একাদশ অধ্যায়ের পঞ্চান্নতম শ্লোকটির

ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলছেন ঃ

'অধুনা সর্বস্য গীতা-শাস্ত্রস্য
সারভূতো অর্থো নিঃশ্রেয়সার্থো
অনুষ্ঠেয়ত্বেন সমুচিত্ত উচ্চতে'—

সমগ্র গীতায় আধ্যাত্মিক মুক্তির যে বাণী তার বাস্তব প্রয়োগের সারাংশ বিবৃত হয়েছে এই শ্লোকে ঃ (১১/৫৫)

'মৎকর্মকৃৎ, মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥'

—হে পাণ্ডব! আমার জন্য যে কর্ম করে, যার পরম পুরুষার্থ আমিই, আমার সেই আসক্তিশূন্য ভক্ত যে সর্বভূতে দ্বেষরহিত, সে-ই আমাকে লাভ করে।

আধ্যাত্মিক বিকাশের যে বিজ্ঞান তার গবেষণাগারটি এই জীবনে, যার দুটি কাজের ক্ষেত্র—একটি বাইরের কাজে ও অন্যটি অন্তরের ধ্যানচিন্তায়। মন্দিরে বা মসজিদে বা গীর্জায় বা বাড়ির ঠাকুরঘরেও এই গবেষণা চলতে পারে, যদি ভাবনা সঠিক হয়। তবে এ-সবের থেকে একটা সুশিক্ষিত ও শুদ্ধ মন আরও উন্নত এক গবেষণার ক্ষেত্র, এতে কোন সন্দেহ নেই। পূজা, প্রার্থনা ও এই ধরনের ধর্মীয় আচারগুলি এই পথে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে যদি এগুলি মানুষকে সংকীর্ণতার বেড়াজালে আবদ্ধ না করে এক গতিশীল আধ্যাত্মিকতায়, এক চরিত্রগঠনের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে।

২২ 'বেদান্ত' ও আধুনিক বিজ্ঞান (একটি সম্পর্কের অনুসন্ধান)

স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের দেখিয়েছেন, ভারতবর্ষের বেদান্তধর্ম ও আধুনিক বিজ্ঞানচেতনা লক্ষ্যমাত্রা ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে কতটা

নিকটবর্তী। উভয়েই এক আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব, কার্যকারণের উৎস-অনুসন্ধান, পদার্থ ও শক্তির নিত্যতাসূত্র ও সমগ্র বিশ্ব এবং জীবকুলের ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব—এই সবগুলির মধ্যে বিধৃত রয়েছে সাধারণ কতকগুলি সম্পর্ক ও শর্ত যা অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে। পাশ্চাত্যের অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক ধর্মতত্ত্বে নয়, প্রাচ্যের বেদান্তগবেষণায় ও আধুনিক বিজ্ঞানে সৃষ্টিতত্ত্ব যেভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে তার উল্লেখ করে স্বামী বিবেকানন্দ মূল কারণটির সংজ্ঞা নির্দেশ করছেন 'আত্ম-বিকাশশীল এক কারণশরীর' রূপে। অন্তিম সত্য অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই, বেদান্ত এরই নাম দিয়েছে 'ব্রহ্ম', যাকে আমরা বিজ্ঞানের ভাষায় একটি 'সর্বজনীন আধ্যাত্মিক ভূমি' বলতে পারি। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ (তৃতীয় অধ্যায়, ১ম অনুবাক্) 'ব্রহ্ম'-এর সংজ্ঞা দিয়েছে অনুপম ভাষায়, যা প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক চিন্তার মানুষের কাছে আদরণীয় হবে ঃ

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি;
যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব।
তদ্ ব্রহ্মেতি। ...'

—যার থেকে এই জাত বস্তুনিচয় ও প্রাণীকুলের সৃষ্টি, যাকে আশ্রয় করে সেগুলির অবস্থান, অন্তিমে যাতে সেগুলির পুনরভিগমন—তাকেই জান। তাই ব্রহ্ম।

আধুনিক বিজ্ঞানীর কাছে ঐ 'আত্ম-বিকাশশীল কারণশরীর' একটি জড়জগতের বস্তুসত্তা। বিজ্ঞানী ফ্রেড হয়েলের মতে এইটি হলো 'ভিত্তি ভূমি' অথবা আর এক পরিভাষায় 'মহাজাগতিক ধূলিকণা'। বেদান্তের দৃষ্টিতে এই ব্রহ্মবস্তুই ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে বিকশিত যে মানুষ, তার

মধ্যে চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত চিত্ত-আকাশ। এই চিত্ত-আকাশকে 'সর্বজনীন আধ্যাত্মিক ভূমি' বলা যেতে পারে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও সুপ্রাচীন বেদান্তের মধ্যে এই যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক, এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোয় অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম-সম্মেলনে (১৮৯৩ খ্রীঃ) তাঁর অবিস্মরণীয় বক্তৃতায় বললেন ঃ (তদেব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২)

"আজকাল বৈজ্ঞানিকগণ 'সৃষ্টি' না বলে 'বিকাশ' শব্দ ব্যবহার করছেন। হিন্দু যুগ যুগ ধরে যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করে আসছে সেইভাব আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের নূতনতর আলোকে আরো জোরালো ভাষায় প্রচারিত হবার উপক্রম দেখে তার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হচ্ছে।"

বেদান্ত যেভাবে আধ্যাত্মিক সত্যকে ও আধ্যাত্মিক নীতিকে সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা এখনও সেভাবে ঐ সত্যকে ও ঐ নীতিকে স্থান দেয় নি। তা সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীতে টেইলহার্ড দ্য চার্ডিন, জুলিয়ান হাক্সলি প্রভৃতি জীববিজ্ঞানী-সহ বহু বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানের একান্ত জড়বস্তু-নির্ভরতার ভাব থেকে বিজ্ঞানকে মুক্ত করতে ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তাকেও বিজ্ঞান-গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করতে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি, টমাস হাক্সলি জড়বাদকে 'অনুপ্রবেশকারী' আখ্যা দিয়েছেন। এই শতাব্দীতে প্রখ্যাত পদার্থবিদেরাও একান্ত জড়বাদ-নির্ভরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপন করেছেন। স্যার জেম্স জিন্স দেখাচ্ছেন কিভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে ছবি উঠে আসছে তাতে নিয়ামক শক্তি মন, জড়বস্তু নয় (The New Background of Science, p. 307) ; মহাকাশবিজ্ঞানী আর এ. মিল্কম্যান তো জড়বাদকে 'বুদ্ধিহীনতার দর্শন' আখ্যা দিতে দ্বিধা করেন নি। (An Autobiography, last chapter)

২৩ দর্শন ঃ বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয়

বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যা যখন নিরেট জড়বাদ থেকে ক্রমশ নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে, বিংশ শতাব্দীর জীববিদ্যাও এই ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। সমগ্র আধুনিক বিজ্ঞানচিন্তা একটি নীরব আধ্যাত্মিক বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত করে চলেছে তীব্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। তাই বিজ্ঞানচিন্তার আঙিনায় এসেছে মন ও চেতনার উন্নয়নের দাবি। বৈজ্ঞানিক জীনস্ একেই বলেছেন 'বিজ্ঞানের নতুন পটভূমি'। এই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন ঃ (The New Background of Science, pp. 2-6)

"উনবিংশ শতাব্দী শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে পুরান দার্শনিক ভাবনাগুলি অকেজো হয়ে গেছে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা এক নতুন দর্শনের জন্ম দিয়েছেন।

"এই নতুন দর্শনের মূলকথাটি হলো এই যে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতিকে আর নিজের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নদৃষ্টিতে দেখছে না। অনেক সময়ই চারিদিকে যা কিছু, এ তার নিজেরই সৃষ্টি, নিজেরই নির্বাচন, নিজেরই কল্পনা—আবার তা হয়তো নিজেরই ধ্বংসের অপেক্ষায়।

"অতএব বিংশ শতাব্দীতে যে বিজ্ঞানের ইতিহাস, সে ইতিহাস আটপৌরে মানুষের সংকীর্ণ দৃষ্টি থেকে উদারতর বিশ্বদৃষ্টিতে মুক্তি পাবার এক ইতিহাস।"

জুলিয়ান হাক্সলি ও চার্ডিন লক্ষ্য করলেন যে জৈবিক ক্রমবিকাশের ধারায় জগতে ক্রমশ মানুষের এক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি উঠে আসছে। জীববিদ্যার ক্ষেত্রে ক্রমবিকাশের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বৈজ্ঞানিক চার্ডিনের ভাষায় যেখানে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অন্তঃসত্তার উদ্‌ঘাটন চলেছে সেখানে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বহিরঙ্গের বিশ্লেষণ চলছে পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যায়। বেদান্ত এই অন্তঃপ্রকৃতির নাম দিয়েছে প্রত্যক্ষ রূপ, বহিঃ প্রকৃতির নাম দিয়েছে পরোক্ষ রূপ, যদিও দুটি রূপ একই প্রাকৃতিক

বিষয়ের বা ঘটনার। আধুনিক বিজ্ঞানে যখন এই অন্তঃপ্রকৃতিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, তখন গবেষণার ক্ষেত্রে যে বৈজ্ঞানিক পটভূমিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যেও আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে গ্রাহ্য করা দরকার। এই ভিত্তি আমাদের বেদান্তের মূলগত সত্য বা ব্রহ্মের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এই যে বহিরঙ্গের জ্ঞান ও অন্তঃসত্তার জ্ঞান, এই দুই মিলিয়ে তৈরি হয় দর্শন। ভারতবর্ষের বেদান্ত সুপ্রাচীন কালে এই জ্ঞানালোককেই বলেছে 'সম্যক জ্ঞান', যা জীবন ও জগৎ সম্পর্কে একটা সুসংহত ধ্যান-ধারণা নিয়ে উপস্থিত হয়। যা সত্য তার কাছে অন্তর বা বাহির বলে কোন ভেদ নেই। মানুষই এই বিভেদ তৈরি করে তার নানা প্রয়োজনে। কখনও এই প্রয়োজন অধ্যয়ন ও গবেষণাকর্মের সুবিধার ক্ষেত্রে, আর কখনও এই প্রয়োজন দৈনন্দিন জীবনচর্যায়।

বিজ্ঞানের নানা শাখায় চলেছে একের অনুসন্ধান, ঠিক তেমনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গতিপ্রকৃতিতেও ফুটে উঠছে এক সংহত সত্তার অনুসন্ধান। এই পথে বহির্বিজ্ঞান ও অন্তর্বিজ্ঞান উভয়েই মিলিত হতে চাইছে এক পরম সত্যের অভিমুখে। বেদান্ত একেই বলেছে 'ব্রহ্ম' ও এই পরম সত্যলাভের পথকে বলেছে 'ব্রহ্মবিদ্যা'। জাগতিক ও বিমূর্ত জগতের পরম সত্য, যা অনন্তের অভিসারী, সে-ই 'ব্রহ্ম'। তাই মুণ্ডক উপনিষদ্ ব্রহ্মবিদ্যাকে সর্ববিদ্যা-প্রতিষ্ঠা বা সর্ববিদ্যার ভিত্তিভূমি বলতে চেয়েছে। গীতায় (১৩/২) শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ঃ

'ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যৎ তজ্‌জ্ঞানং মতং মম।'

'—প্রকৃতির বস্তুরাশি ও ঘটনারাশির বাহিরের জ্ঞান অর্থাৎ 'ক্ষেত্র' এবং ভেতরের জ্ঞানরাশি অর্থাৎ 'ক্ষেত্রজ্ঞ' এই উভয়ের মিলনে সত্যজ্ঞান ও সত্যদৃষ্টি উদ্ভাসিত হয়, এই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) মত।'

এই যে সবকিছুকে গ্রহণ করে নেবার ক্ষমতা বৈদান্তিক চিন্তাভাবনার মধ্যে প্রতিফলিত, সে বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ

করেন। রোমাঁ রোলাঁ বলেন ঃ (The Life of Vivekananda, p. 289)

'বিবেকানন্দের নিজের চিন্তার নিরিখে সিদ্ধান্ত এমন একটা দৃঢ় জায়গায় ছিল যে বিজ্ঞান মুক্ত ধর্মচিন্তাকে গ্রহণ করল কিনা, এ-সম্বন্ধে তাঁর যেন একটা উদাসীনতার ভাব, একটা নীরব আত্মগরিমার ভাব কাজ করত। এর কারণ তিনি যে ধর্ম প্রচার করেছেন সে ধর্মচিন্তা বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছে। সে ধর্মচিন্তা সমস্ত মত ও পথের সত্য-অনুসন্ধানী একনিষ্ঠ মানুষদের সাদরে আমন্ত্রণ করেছে।' ১৮৯৬ সালে লণ্ডনে স্বামীজী 'ব্রহ্ম ও জগৎ' বিষয়ে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার এক অংশে তিনি বলছেন ঃ (বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০৫)

'বিজ্ঞানের গতি কোনদিকে তা কি আপনারা বুঝছেন না? হিন্দুজাতি মনস্তত্ত্বের আলোচনা করতে করতে দর্শনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। ইউরোপীয় জাতি বাহ্যপ্রকৃতির আলোচনা করতে করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। এখন উভয়েই একস্থানে পৌঁছচ্ছেন। মনস্তত্ত্বের ভেতর দিয়ে আমরা সেই এক অনন্ত সার্বভৌম সত্তায় পৌঁছচ্ছি—যিনি সকল বস্তুর অন্তরাত্মা, যিনি সকলের সার ও সকল বস্তুর সত্যস্বরূপ, ...। জড় বিজ্ঞানের দ্বারাও আমরা সেই একই তত্ত্বে পৌঁছচ্ছি।'

২৪ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভৌতবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের দিকটি সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের উক্তির মধ্যে মানববিজ্ঞানের এই পূর্ণতালাভের সাধনা অবিস্মরণীয় ভঙ্গিতে প্রকাশিত ঃ (১১শ স্কন্ধ, ৭ম অধ্যায়)

'প্রায়েণ মনুজা লোকে লোকতত্ত্ববিচক্ষণাঃ।
সমুদ্ধরন্তি হ্যাত্মানম্ আত্মনৈবাশুভাশয়াৎ ॥' ১৯

"সাধারণত, এই জগতে বহিঃপ্রকৃতির সত্য অনুসন্ধানে যাঁরা নিজেদের নিয়োগ করেছেন সেই বুদ্ধিমান মনীষিগণ সর্বপ্রকার অশুভ চিন্তার উৎসগুলি থেকে নিজেদের বিরত রাখেন।"

আত্মনো গুরুরাত্মৈব পুরুষস্য বিশেষতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রেয়োঽসৌ অনুবিন্দতে ॥ ২০

"একজন মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষত, তার গুরু তার নিজেরই অন্তরাত্মা। এর কারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ও তার থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্য দিয়েই সে নিজের কল্যাণের পথ দেখতে পায়।"

পুরুষত্বে চ মাং ধীরাঃ সাংখ্যযোগবিশারদাঃ।
আবিস্তরাং প্রপশ্যন্তি সর্বশক্ত্যুপবৃংহিতম্ ॥ ২১

"এই মানবজাতির মধ্যেই যে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ অধ্যাত্মবিদ্যা আয়ত্ত করেছেন, তাঁরাই আমাকে (সর্বভূতান্তরাত্মা যে আমি) উপলব্ধি করতে পেরেছেন সমস্ত শক্তির এক সীমাহীন আধাররূপে।"

২৫ বৈদান্তিক দৃষ্টিতে জীবের ক্রমবিকাশ

সমগ্র ক্রমবিকাশের ধারাকে বেদান্ত 'পদার্থ বা প্রাণীর গঠন ও রূপের এক পরিবর্তনশীল বিকাশ'—এইভাবেই দেখে এবং প্রত্যেকটি বিকাশকে অনন্ত আত্মস্বরূপেরই ক্রমবর্ধমান বিকাশরূপেই ব্যাখ্যা করে। বেদান্তের দৃষ্টিতে এই ঘটনা পদার্থের ক্রমবিকাশ ও অন্তর্নিহিত শক্তির ক্রমপ্রকাশ। আধুনিক জীববিদ্যা জীবনের উৎপত্তির সেই প্রাচীন যুগ থেকে ক্রমবিকাশের একটি ভিত্তি বর্তমান, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। সেই ভিত্তি হলো এক চৈতন্যসত্তার ভিত্তি যাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে এক ধরনের অভিজ্ঞতা। জীবদেহের কোষকে জীববিদ্যার ভাষায় যদি 'নিজেকে নিজে দ্বিগুণ করতে পারে এরকম পদার্থ' এই সংজ্ঞায় চিহ্নিত

করি, তাহলে তার মধ্য দিয়ে এমন এক ভূয়োদর্শনকে তার নবতর মূল্যমানে সম্প্রকাশিত হতে দেখি যা এই সৃষ্টির লক্ষ-কোটি বছরের ইতিহাসে কোনদিনই প্রকাশ পায় নি।

ক্রমবিকাশের ধারায় এই ভূয়োদর্শনের মূল যে 'চেতনা', তা ক্রমশ বৈচিত্র্যময় ও সুশোভিত হয়ে উঠেছে। ফলে অভিজ্ঞতাও ব্যাপ্ত হয়েছে। এই ব্যাপ্তির একদিকে অভিজ্ঞতালাভের বিষয়, অন্যদিকে অভিজ্ঞতালাভের কর্তা। স্নায়বিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার নব নব আবিষ্কারগুলি, এই চেতনার বিকাশ প্রাণীদেহে কিভাবে ঘটছে ও কিভাবে এই চেতনা পরিবেশের দ্বারা বারবার পরাভূত হচ্ছে, তার অপূর্ব বিশ্লেষণ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে।

আবার পৃথিবীর মাটিতে মনুষ্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই 'চেতনা' যেন নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে ও নতুন সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। জুলিয়ান হাক্সলির কথায় 'মানুষ বহুভাবেই অপূর্ব', অন্যান্য প্রাণীরা সাধারণত বাইরের পরিবেশের ওপর বেশি করে নির্ভরশীল, নিজের অন্তরের দিকটি সম্পর্কে খুব কমই সচেতন। মানুষ কিন্তু নিজের সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন এবং সেই সঙ্গে প্রত্যেকটি নিজস্ব এবং জাগতিক অভিজ্ঞতাগুলিকে কখনও বিষয়রূপে, আবার কখনও অভিজ্ঞতাগুলির কর্তারূপে পর্যবেক্ষণ করার ও কাজ করারও ক্ষমতা রাখে।

এইখানেই মানুষের অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। সে কথা বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, আবার বেদান্তও বলে।

স্নায়ুতত্ত্ব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে আত্মসচেতনতা মানুষকে প্রকৃতির প্রভু করে তুলেছে। আবার এই আত্মসচেতনতা মানুষের মধ্যে এসেছে, তার মস্তিষ্কের যে ক্রমবিকাশ প্রাকৃতিক নিয়মে ঘটেছে তার ফলে। আদিম মানুষের মধ্যে যা ছিল এক অস্বচ্ছ অভিজ্ঞতা, আধুনিক মানুষের মধ্যে তারই বিকাশ ঘটেছে সচেতন কর্মপ্রয়াসের মধ্যে। ভারতীয় দর্শন

এই সচেতনতার অনন্ত সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বৈদান্তিক দৃষ্টিকোণের এক অপূর্ব ব্যাখ্যা চোখে পড়ে ঃ (১১শ স্কন্ধ, ৯ম অধ্যায়)

"সৃষ্ট্বা পুরাণি বিবিধান্যজয়াত্মশক্ত্যা বৃক্ষান্ সরীসৃপপশূন খগদংশমৎস্যান্।
যৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায় ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ ॥" ২৮

—দৈবীসত্তা তার অন্তর্নিহিত শক্তিবলে নিজেকে নানারূপে প্রকাশিত করেছে—যথা বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশুপক্ষী, পতঙ্গ, মাছ ইত্যাদি। এতেও সেই সত্তা শক্তিলাভ করতে পারে নি, তাই নিজেকে মানুষ রূপে প্রকাশিত করেছে, সেখানে সর্বভূতান্তরাত্মা পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার সম্ভবপর। এখানেই সেই দৈবী সত্তার আনন্দ সর্বোত্তম।

২৬ ভারতের ধর্মপিপাসা ঃ এক উপলব্ধি—কল্পনা নয়

ক্রমবিকাশ যতই বিশ্বের রহস্যভেদ করেছে, মানুষ ততই নিজের স্বরূপের রহস্যভেদ করতে চেয়েছে। এই স্ব-স্বরূপের রহস্যকে অনুদ্ঘাটিত রেখে বিশ্বরহস্য অনুসন্ধান করে চললে আমরা খেই হারিয়ে ফেলব।

ফলে বিজ্ঞান, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র সবক্ষেত্রেই অনুমান ও কল্পনাই কাজ করবে। বিশেষত মানুষ ও প্রকৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটনের জরুরী কাজটি ভারতীয় মন শুধুমাত্র অনুমান ও কল্পনাতে আটকে রাখতে চায় নি। ভারতের চিন্তাশীল ঋষিরা অন্তর্জগতের অনুসন্ধানে নেমে পড়েছিলেন সাহসের সঙ্গে। সে পথে একমাত্র পদচিহ্ন নিজের অন্তরস্থিত জীবাত্মা (বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষায়, ১/৪/৭)। এইভাবে অন্তর্জগতের গভীরে তাঁরা পেয়েছেন এক অনন্ত, অসীম সত্তার সন্ধান। এই অনন্ত সত্তার অবস্থিতি এই জগতের প্রত্যেকটি আপাত-সীমাবদ্ধ ও আপাত-সসীম অস্তিত্বের

পেছনে। এই অনন্ত সত্তা (ভারতীয় দর্শনের ভাষায়) এক অর্থে অনুভব-স্বরূপ, অন্য দিক থেকে চিৎ-স্বরূপ। এই স্বরূপসত্তার ওপর ছায়ার মতো প্রবাহিত হয়ে চলেছে শত শত বস্তুসত্তার প্রতিবিম্ব। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই সাহসিক অনুসন্ধানের গতিপ্রকৃতি ও তার লক্ষ্যকে অপূর্ব ছন্দে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ (৩/৪/১)

'যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম
য আত্মা সর্বান্তরস্তং...'

—এই ব্রহ্ম সাক্ষাৎ ও অপরোক্ষ, আবার এই ব্রহ্মই যা সকলের অন্তরস্থিত।

ছান্দোগ্য উপনিষদ্ মরণশীল মানুষকে আবাহন করেছে অমর দৈবী সত্তারূপে তার *'তত্ত্বমসি, শ্বেতকেতো'* শ্লোকাংশের মধ্য দিয়ে (৬/৮/৭)। বারবার উপনিষদ্ আমাদের শুনিয়েছে সেই মহাসত্য। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিধৃত করতে পারে এরকম কোন সূত্র যদি একজন বৈজ্ঞানিক তার মস্তিষ্ক থেকে আবিষ্কার করতে পারেন, তাহলে আত্মচিন্তায় স্থিত ব্যক্তিত্ব কত উদার ও বিশাল হৃদয় নিয়ে সমগ্র বিশ্বকে স্পর্শ করতে পারেন? কারণ আমরা জানি, আত্মা অপরিবর্তনীয়, আত্মা অনন্ত ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ। নানাভাবে ও নানাবস্তুতে বিভক্ত এই পৃথিবীতে যা অবিভাজ্য, গীতা তাকেই বলতে চাইছে মূলগত সত্য। (১৩/১৬) বিশ্বরহস্যের চাবিকাঠি মানুষ্ খুঁজে পেয়েছে নিজের অন্তররহস্য উদ্‌ঘাটনের পথে। উপনিষদের ঋষিগণ তাই বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু আবিষ্কার করেছেন মানুষের কেন্দ্রে। এই আবিষ্কার প্রমাণ করেছে যে মানুষের স্বরূপ অনন্ত, অসীম আর সমগ্র বিশ্ব উজ্জ্বল এই আত্মজ্যোতির আলোকে। এই সত্যের উপলব্ধি জীবনের লক্ষ্য। উপনিষদের ভাষায় ঃ (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ২/১৫)

'যদাত্মতত্ত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপমেনেহ যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ।
অজং ধ্রুবং সর্বতত্ত্বৈর্বিশুদ্ধং .
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাপৈঃ ॥'

—আত্মসংযত অধ্যাত্মপথের পথিক যখন ইহজীবনেই স্বয়ংপ্রভু সেই জীবাত্মাকে সর্বভূতান্তরাত্মা পরম ব্রহ্মরূপে উপলব্ধি করেন, তখন সেই প্রকৃতিবিকৃতিশূন্য ধ্রুবপদ স্পর্শ করে তিনিও সর্বপাপ থেকে মুক্ত হন।

উপনিষদের অমর সাহিত্য এইরূপ বহু অনুপম শ্লোকের মধ্য দিয়ে আমাদের সেই আনন্দদায়ক আবিষ্কারের খবর এনে দেয়। আত্মতত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করে তাঁকে একদিকে যেমন দেখেছেন আত্মার সচ্চিদানন্দ রূপ, অপরদিকে পেয়েছেন পৃথিবীর অনন্ত অভিজ্ঞতারাশির এক যোগসূত্র। এই আবিষ্কারকে তাঁরা বলছেন সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দের বা সচ্চিদানন্দের এক সীমাহীন আধার। এই সত্য আবিষ্কার করতে গিয়ে ও জীবনের পথে এই গবেষণার ভূমিকা অনুসন্ধান করতে গিয়ে সমগ্র ক্রমবিকাশের ধারা—সেটা মহাজাগতিক এবং জৈবিক বিশেষ করে মানবিক ক্ষেত্রে—তার প্রকৃত অর্থ নিয়ে তাঁদের কাছে ধরা দিয়েছে।

প্রাণী খোঁজে তার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি। আধুনিক জীববিদ্যার ভাষায় এই তৃপ্তি তার লক্ষ্য। অন্যদিকে উপনিষদের ভাষায় আছে মুক্তি ও পূর্ণতা। আমরা বদ্ধ, বিভক্ত—আমরা মুক্তি চাই। আমরা একত্ব চাই, পূর্ণতা চাই। যীশু এই পূর্ণতাকে বলছেন পরম পরিপূর্ণতার পরাকাষ্ঠা। 'অতএব তুমি পূর্ণতালাভ কর, যেমন তোমার স্বর্গস্থ পিতা পরিপূর্ণ।' (ম্যাথু, ৫ম, ৪৮) জীবনের ক্রমবিকাশের মহান লক্ষ্য এই মহান পরিপূর্ণতা, যা বুদ্ধের কথায়, 'বোধি' লাভ—পূর্ণতার আলোকপ্রাপ্তি। এই পথে চেতনা তার পক্ষবিস্তার করে চলে মহানন্দে। এই পক্ষবিস্তার শুধু বাইরের জগতে নয়, নিজের অন্তরেও। এই বিস্তারের পথে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, বিজ্ঞান,

এমনকি সামাজিক ও রাজনৈতিক কলাকৌশলগুলিও সাহায্য করে চলে। বিজ্ঞানের অভিযাত্রায় পদে পদে জ্ঞানার্জন আনে শক্তি, ঠিক তেমনই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের পথেও। এই অন্তর্জগতের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অভিযাত্রা মানুষের জ্ঞানের, শুধু পরিমাণে নয়, গুণগত মানেও আনে পরিবর্তন।

২৭ সামাজিক নীতিবোধের ভূমিকায় ধর্ম

আধ্যাত্মিক বিকাশের বা মনোসামাজিক ক্রমবিকাশের দীর্ঘ পথে এগিয়ে যেতে গেলে মানুষকে তার জৈব আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সংযত করতে হবে ; তার আভ্যন্তরীণ জীবনে এক ধরনের শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সংযত ছন্দ নিয়ে আসতে হবে নিজের সজ্ঞান প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। এই হলো দ্বিতীয় 'হোমোস্ট্যাসিস' যেটা নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে। 'গীতা'-তে এই দ্বিতীয় 'হোমোস্ট্যাসিস'-এর ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে যেমন 'সমত্বং যোগ উচ্চতে'—যোগের অর্থ সমত্ব। প্রখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ্ ক্লড বার্নার্ড-এই আধ্যাত্মিক অবস্থাকেই ব্যাখ্যা করেছেন নিচের সূত্র ধরে— 'মুক্ত জীবনের একটাই শর্ত, তা হলো সেই জীবন অন্তরের একটি উদার সামাজিক পরিব্যাপ্তির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বিধৃত।'

এই শৃঙ্খলাবোধকেই ভারতবর্ষ বলেছে ধর্ম যা নীতিবোধের মধ্য দিয়ে একটি সুশৃঙ্খল মানবসমাজকে ধরে রাখতে পারে। এই ধর্ম বা নীতিবোধ বিসর্জন দিলে মানুষ আর পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না। ভারতীয় প্রজ্ঞা তাই উচ্চারণ করে—'ধর্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ', এই যে ধর্ম সমগ্র মানবজাতি ও তার সামাজিক সম্পর্কগুলিকে ধরে আছে, এর সঙ্গে আচার, আচরণ, পরলোক ইত্যাদির কোন সম্পর্ক নেই। কতকগুলি ইট পরপর সাজিয়ে দিলেই যেমন দেওয়াল তৈরি হয় না, সিমেন্ট দিয়ে তাকে গাঁথতে হয়, ঠিক তেমনই কতকগুলি মানুষ একত্রিত হলেই সমাজ তৈরি হয় না। সেখানে দরকার হয় একটা নীতি যা নিশ্চল ব্যক্তিমানুষকে

গতিশীল ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। সেই বিস্তারশীল মানসিকতাই সমাজকে ধরে রাখে। এরই নাম ধর্ম, যা পারস্পরিক নির্ভরতার ওপর জোর দেয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য তাই অপরাপর মানুষের সঙ্গ এত প্রয়োজনীয়। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ এই সত্য ব্যক্ত করেছেন ধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে—*'ধারণাৎ ধর্ম ইত্যাহুঃ, ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ'*— 'ধারণা থেকে এই ধর্মের উৎপত্তি যা প্রজাগণকে ধারণ করে'।

২৮ মনোসামাজিক ক্রমবিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষার্থ

ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য কামনা-বাসনাকে ছোট করে দেখে না, বা অর্থ, যা কামনা-পরিতৃপ্তিতে সাহায্য করে, তাকেও ঘৃণা করে না। কাম ও অর্থ পুরুষার্থ অর্থাৎ মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। তবে অপ্রতিরোধ্য ইন্দ্রিয়াসক্তি থেকে যে লোভ ও মোহের সৃষ্টি হয় তাকে ভারতীয় ঐতিহ্য অনৈতিক বলে উল্লেখ করেছে, কারণ তা সমাজ-বিরুদ্ধ। তাই অর্থ ও কাম যাতে মানুষকে সমাজ-বিরুদ্ধ করে না তোলে, তাই তৃতীয় পুরুষার্থ ধর্মের কথা বলা হয়েছে যা মানবসমাজকে সামগ্রিকভাবে রক্ষা করতে পারে। মুষ্টিমেয় শক্তিশালী ও চতুর লোক যাতে কাম ও অর্থকে কুক্ষিগত করে না রাখে সেইজন্যই প্রয়োজন এক নীতিবোধ বা ধর্মের। তখন ধর্মের দ্বারা সংযত কাম সমাজে সৃজনশীল ভূমিকা গ্রহণ করে। শ্রীকৃষ্ণের কথায় ঃ (গীতা—৭/১১)

"ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ।"

—ধর্মের অবিরোধী কাম যা সর্বজীবে অনুস্যূত, তা আমিই।

ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য এই ধর্ম, অর্থ ও কামকে ত্রিবর্গ নামে অভিহিত করেছে ও এই তিন পুরুষার্থের মিলিত রূপই এক সুশৃঙ্খল মানবসমাজকে ধরে রাখতে পারে বলে ঘোষণা করেছে, সে সমাজ আস্তিক, নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী যে কোন রকম মানুষদের দ্বারা নির্মিত হোক

না কেন। এইসঙ্গে আমাদের শাস্ত্র যোগ করেছে চতুর্থ পুরুষার্থ যার নাম 'মোক্ষ'। মোক্ষ এই সমাজ পেরিয়ে এক উচ্চতর লক্ষ্যের দিকে আমাদের আহ্বান করে, যে পথে কিছু মানুষ এগিয়ে পড়ে সত্যকে উপলব্ধি করার চরম সাহসিকতা নিয়ে। এই 'মোক্ষ' অন্যান্য মানুষের কাছে অনুভূত হয় ধর্মবোধের মধ্য দিয়ে তাদের সামাজিক পরিমণ্ডলে। ফলে আধ্যাত্মিক ও জাগতিক, সামাজিক ও বন্ধনমুক্ত অতিসামাজিক সবই ধর্মে এসে মিলিত হয়। এই ধারণশীল ধর্মের জয়গাথা ভারতবর্ষ চিরকাল গেয়ে এসেছে ও আজও গেয়ে চলেছে কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির উৎস এই ধর্মে। সমাজ অতিক্রম করে যে মোক্ষের ধারণা, সেই আদর্শের উচ্চতর সোপানে পৌঁছেছেন ভারতবর্ষের মরমী সাধকের দল, এবং শুধু ভারতবর্ষের নন, সমগ্র বিশ্বের।

মনোসামাজিক ক্রমবিকাশের যে তত্ত্ব বিংশ শতাব্দীর জীববিদ্যায় আমরা লক্ষ্য করছি তা সেই ধর্মবোধেরই প্রতিধ্বনি। এই প্রসঙ্গে এসেছে মানুষের ক্রমবিকাশে গুণগত তত্ত্ব ও আপূরণের মতবাদ। সংকীর্ণ আমিত্ব থেকে, তার ভোগবাসনার বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার যে আহ্বান আধুনিক ক্রমবিকাশের তত্ত্ব উপস্থাপিত করছে, তা আমাদের কাছে সুপ্রাচীন 'গীতা'র সেই অনাসক্তি-যোগেরই যেন প্রতিধ্বনি।

২৯ ধর্ম—জাতিতত্ত্ব বনাম আধ্যাত্মিকতা

ধর্মীয় মতবাদকে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিয়ে গেলে বিশ্বের প্রত্যেকটি ধর্মমত দুটি রূপকে অভিব্যক্ত করে—এক, ধর্মমতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা—দুই, ঈশ্বরোপলব্ধি বা ঐ জাতীয় উচ্চতম উপলব্ধির পথে ধর্মের অভিযাত্রা। প্রথমটি নিয়ে আসে অনেক আদেশ ও নিষেধের তালিকা, খাদ্য-বস্ত্র-বিবাহ ইত্যাদি নিয়ে বহু রকমের সামাজিক নিয়ম আর সেইসঙ্গে অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনী ও নানা ছাঁদের

সৃষ্টিরহস্য। এ হলো ধর্মমতের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা যা প্রত্যেকটি ধর্মমতের ক্ষেত্রেই অভিনব। এ ধর্মবিজ্ঞান নয়, এ এক ধরনের ইতিহাস-বিধৃত বিচিত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন যা ধর্মমতের এক এক প্রকার প্রকাশ বলা যেতে পারে। অপরদিকে ধর্মবিজ্ঞান ধর্মকে বিভিন্ন যোগমার্গে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে যেমন—ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ ও কর্মযোগ। এই দ্বিতীয় পথে প্রকৃত আধ্যাত্মিক গবেষণার হদিশ পাওয়া যায় কারণ এখানেই ব্যক্তিমানুষের নীতিবোধ, শ্রদ্ধা ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের ওপর জোর দেওয়া হয়। এইখানেই ধর্মের এক সর্বজনীন উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের সমাজের পক্ষে এই উৎস অপরিহার্য। আর অপর যে ভূমিকা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম তা অপরিহার্য নয়, তবে অবশ্য ততক্ষণই গ্রহণযোগ্য যতক্ষণ সে আধ্যাত্মিক অভিযাত্রার পথকে কণ্টকিত না করে।

ভারতীয় ঐতিহ্য প্রথমটিকে বলে 'স্মৃতি', দ্বিতীয়টিকে 'শ্রুতি'। ধর্মের 'শ্রুতি' অংশ সর্বজনীন সনাতন সত্য এবং 'স্মৃতি' অংশ প্রয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী, দেশ ও কালের দ্বারা পরিবর্তনীয় এক একটি বিধির সমাহার। তাই শ্রুতি বলে সনাতন ধর্মের কথা আর স্মৃতি যুগধর্মের কথা। স্মৃতি বা যুগধর্ম যুগ অনুযায়ী পরিবর্তনশীল, দেশ অনুযায়ী কখনও প্রয়োজনীয়, কখনও অপ্রয়োজনীয়, এমনকি ক্ষতিকরও হয়ে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতীয় প্রজ্ঞার এই দিকটি তুলে ধরেছেন তার সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ উক্তির মধ্য দিয়ে—'বাদশাহী আমলের টাকা কোম্পানির আমলে চলে না।' ধর্মের সামাজিক ভূমিকায় অনেক অপ্রয়োজনীয় দিক এইভাবে উঠে আসে মানুষের নানা বিকৃত প্রয়াসের পথ ধরে। মানুষ তখন অনেক সামাজিক প্রথাকে অযথা আঁকড়ে থাকে, মনুষ্যত্বহীন আচারগুলি অনুসরণ করে চলে। শুরু হয় ধর্মে ধর্মে বিরোধ, সংঘর্ষ, অত্যাচার, মানুষের সভ্যতার ধারা বদ্ধ হয়ে পড়ে সীমিত চিন্তার পাঁকে।

সব ধর্মভাবনার মূল সূত্র উঠে এসেছে আধ্যাত্মিক সত্য থেকে। এই সত্য ঐ শ্রুতি অংশ। এইটি অপৌরুষেয়, সনাতন এবং বিশ্বজনীন। এই সারসত্যের আবিষ্কর্তা ধর্মবিজ্ঞানের সাধকবর্গ। আবিষ্কৃত সত্য প্রমাণিত সত্য কারণ তা গবেষকদের হাতে যাচাই হয়েছে বারবার। আজও সে সত্য জিজ্ঞাসু সাধকের কষ্টিপাথরে যাচাই হয়ে ওঠার অপেক্ষায়। ভারতবর্ষের বেদ-উপনিষদের ঐ সারসত্যভাগে বিশ্বজনীনতার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে বিশ্বধর্মমহাসভায় প্রদত্ত তাঁর চিকাগো বক্তৃতায় বলেছিলেন ঃ (বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪)

" 'বেদ' শব্দ দ্বারা কোন পুস্তক-বিশেষ বোঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করে গেছেন, বেদ সেই সকলের সঞ্চিত ভাণ্ডারস্বরূপ। আবিষ্কারের পূর্বেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী যেমন সর্বত্রই বিদ্যমান ছিল এবং সমুদয় মানবসমাজ ভুলে গেলেও যেমন ঐ গুলি বিদ্যমান থাকবে, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মগুলিও সেইরূপ। আত্মার সঙ্গে আত্মার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ এবং প্রত্যেক জীবাত্মার সঙ্গে সকলের পিতাস্বরূপ পরমাত্মার যে দিব্যসম্বন্ধ, আবিষ্কৃত হবার আগেও সেগুলি ছিল এবং সকলে বিস্মৃত হয়ে গেলেও সেগুলি থাকবে।

"এই আধ্যাত্মিক সত্যগুলির আবিষ্কর্তাদের নাম 'ঋষি'। আমরা তাঁদেরকে সিদ্ধ বা পূর্ণ বলে ভক্তি বা মান্য করি। আমি এই শ্রোতৃমণ্ডলীকে অতি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে অতিশয় উন্নত ঋষিদের মধ্যে কয়েকজন নারীও ছিলেন।"

হিন্দুধর্ম বা পৃথিবীর যে কোন ধর্মমতের 'শ্রুতি' অংশ সম্পর্কে ওপরের কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। শুধু পার্থক্য এই যে ভারতীয় পরম্পরায় 'শ্রুতি' অংশের সর্বজনীনতা ও 'স্মৃতি' অংশের স্থানিক প্রয়োগ দুটির পার্থক্য পরিষ্কারভাবে স্বীকৃত হয়েছে ও সেইভাবে তাদের ব্যবহার করা হয়েছে, ফলে সামাজিক সংস্কারপন্থী ও নতুন নতুন ধর্মমতের প্রবক্তা, কাউকেই

অত্যাচার করা হয় নি বা মেরে ফেলা হয় নি। বরং তাঁদের কিছু অনুগামী জুটেছে এবং সবাইকেই সম্মান দেওয়া হয়েছে। এর কারণ ভারতবর্ষের অমর সাহিত্য 'উপনিষদে'র সবটাই 'শ্রুতি' ; 'স্মৃতি'-র কোন নামগন্ধ সেখানে নেই, হিন্দুধর্মের কল্যাণচিন্তা ও উদারতা উঠে এসেছে এই উপনিষদ্ থেকে। উপনিষদ্ থেকেই আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কার করার আহ্বান উঠে এসেছে জাতপাতনির্বিশেষে। হিন্দুধর্মের ভেতরে বা বাইরে এই উপনিষদ্-ই একমাত্র সেই পবিত্র গ্রন্থরাজি যা শুধুমাত্র এই সনাতন সত্যের আবিষ্কার এবং জীবনে তার রূপায়ণ—এই আহ্বানেই নিজেকে নিয়োজিত করেছে। এই আহ্বানই ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতিতে এনেছে এক বলিষ্ঠ সমন্বয়ভাবনা।

এই 'শ্রুতি' ও 'স্মৃতি' ভাবনার আলোকে আমরা বিজ্ঞানকে একমাত্র ধর্মে 'শ্রুতি' অংশের সঙ্গেই সম্পর্কিত করতে পারি, বিশেষত এই আত্মানুসন্ধানের সাহসিক গবেষণার পথে, 'স্মৃতি' অংশের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক সামান্যই। জাতিগত ধর্মাচরণ এই 'স্মৃতি' অংশের ওপর জোর দেয়। এই জাতিগত বা গোষ্ঠীগত ধর্মমত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, সামাজিক পরিবর্তনে বাধা সৃষ্টি করে এবং সমাজে বিজ্ঞানচর্চার সৃজনশীল ভূমিকার সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে বসে।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি ধর্মের ইতিহাসে এই জাতিগত এবং গোষ্ঠীগত ধর্মাচরণ ক্রমশ পুরোহিতকুল ও সামন্ততান্ত্রিক প্রভুদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয় এবং অন্যদিকে ধর্মের সর্বজনীন আধ্যাত্মিক সত্য প্রচারিত হয় ধর্মপ্রবক্তা অবতারকল্প পুরুষদের দ্বারা। গোষ্ঠীগত ধর্মাচরণ থাকতে পারে কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে এর স্থান থাকবে আধ্যাত্মিক সত্যানুসন্ধানের নিচে, মানুষকে সে পথে যেতে সাহায্য করার জন্যে, তাকে বাধা দেবার জন্যে নয়।

৩০ ভারতবর্ষ ও ধর্মের প্রতি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

ভৌতবিজ্ঞান এবং জীবনবিজ্ঞানে গবেষণার ও অনুসন্ধানের কৌশল এবং ধর্মজগতে অনুরূপ অনুসন্ধানের কৌশল একই। উভয়ক্ষেত্রেই তথ্যসংগ্রহ, সেগুলির শ্রেণীবিভাগ এবং অন্তর্নিহিত সূত্রগুলি উদ্‌ঘাটন করার উদ্দেশ্য নিয়ে এক নিরপেক্ষ অনুসন্ধান। সেইসঙ্গে জ্ঞানার্জন থেকে ঘটনার নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা এবং মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে জীবনকে আরও ঐশ্বর্যশালী ও পূর্ণাঙ্গ করে তোলার উদ্দেশ্যে সেই জ্ঞানের প্রয়োগ। তাই ধর্মজগতে দেখি ভারতীয় মনীষিগণ অন্তর্জগতের সমস্ত ঘটনাগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে গেছেন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তাঁদের দর্শন ও অভিজ্ঞতা পরবর্তী যুগে বারংবার পরীক্ষিত হয়েছে ও নতুন নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। ফলে ধর্মজগতে যে ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছে তা এক অমূল্য উত্তরাধিকার।

এই যে অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ, প্রবল এবং যুক্তিগ্রাহ্য ভূমি নির্মিত হয়েছে তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা, তথা ভারতবর্ষের কালজয়ী সংস্কৃতি। তাই এই আধ্যাত্মিকতাকে দেখি আধুনিক বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাতে। আমরা লক্ষ্য করি এই সংস্কৃতিকে পাশ্চাত্যের প্রত্যেকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য গর্ব অনুভব করতে।

প্রখ্যাত পণ্ডিত রোমাঁ রোলাঁ ভারতীয় চিন্তার এই দিকটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলছেন ঃ (The Life of Vivekananda, p. 196)

"প্রকৃত বৈদান্তিক কোন পূর্বনির্ধারিত ধারণা নিয়ে কাজ শুরু করেন না। পূর্ণ স্বাধীনতা ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাহস নিয়ে তিনি ধর্মতত্ত্বের গভীরে প্রবেশ করেন ও ঘটনাগুলির সমন্বয়সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করেন। কোন পুরোহিততন্ত্রের অপেক্ষা না করে যে কোন সাধক এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঘটনাবলীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেবার জন্য এগিয়ে যেতে

পারেন সম্পূর্ণ স্বাধীনসত্তা নিয়ে।”

মানুষের প্রকৃত সত্তার অনুসন্ধান করতে গিয়ে উপনিষদের প্রজ্ঞাবান ঋষিগণ মূল সত্যটিকে আবিষ্কার করেন—আর তা হলো এই যে এই সসীম মানুষের পশ্চাতে রয়েছে তার দৈবী সত্তা, তা আত্মা যা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। এই দেহ, মন, অহংতত্ত্ব সেই অসীম দৈবী সত্তার এক বহিরঙ্গ রূপমাত্র। এই আবিষ্কার থেকে এসেছে আর এক নতুন আবিষ্কার যখন সাধকেরা দেখলেন ও আমাদের কাছে ঘোষণা করলেন যে এই সমগ্র বিশ্বই ঐ অসীম দৈবী সত্তার বহিরঙ্গ রূপ। এরই নামকরণ তারা করলেন ‘ব্রহ্ম’—যা জগদ্‌ব্যাপী, যা ‘সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্’।

৩১ পরা বিদ্যা ও অপরা বিদ্যা

মুণ্ডক উপনিষদে এক জিজ্ঞাসু ছাত্রের মুখে তার শিক্ষক বা গুরুর প্রতি আমরা এই প্রশ্নই দেখতে পাই ঃ

‘কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বম্ ইদম্ বিজ্ঞাতম্ ভবতীতি’—‘হে মহাভাগ, কোন্ সত্য পরিজ্ঞাত হলে এই প্রকাশিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাধারণ সত্যটি আমরা জানতে পারব?’ (১/১/৩)

এই বহির্জগতের ও অন্তর্জগতের যতরকমের প্রকাশ তার পেছনে এমন কোন সাধারণ সত্য কি আছে যা এই প্রকাশিত রূপবৈচিত্র্যকে বুঝতে সাহায্য করে? এই বিভিন্নতার মধ্যে কি কোন ঐক্য আছে? এই বহুর পেছনে কি কোন ‘এক’ আছে, না নেই? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পাচ্ছি গুরুর অপূর্ব প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে ঃ

দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে, ইতি হ স্ম যদ্‌ব্রহ্মবিদো বদন্তি—পরা চৈবাপরা চ ॥
(তদেব, ১/১/৪)

—বিদ্যা দুই ধরনের—যা মানুষ অর্জন করতে পারে। এই হলো ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের ঘোষণা। এক পরা বিদ্যা যা শ্রেষ্ঠতর বিজ্ঞান বা শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান—

দুই, অপরা বিদ্যা যা লৌকিক বিদ্যা বা লৌকিক বিজ্ঞান।

দুই পথেই অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। উপনিষদের ঋষিগণের মতে অপরা বিদ্যা বলতে বোঝায় চতুর্বেদ, যজ্ঞবিধি, ব্যাকরণ, জ্যোতির্বিদ্যা ছন্দশাস্ত্র ইত্যাদি। অর্থাৎ এই বিদ্যা বলতে আধুনিক যুগে আমরা যাকে প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিজ্ঞান বলি তার সমগ্র দিকটি এসে পড়ে। এই সঙ্গে ধর্মপুস্তকে নিবদ্ধ আচরণবিধি ও অভিজ্ঞতার যে সব কথা সাধকেরা লিপিবদ্ধ করে গেছেন ও আমরা পরে পাঠ করছি, সেগুলিও এসে পড়ে।

এখানে নৈর্ব্যক্তিক, প্রত্যক্ষ জ্ঞাননির্ভর ও নিরপেক্ষ এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির আমরা দেখা পাই। এই বৈজ্ঞানিক মন অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং এই মন কোন একটা মতবাদ পছন্দমত হলেই তাকে গ্রহণ করবে তা নয়। সত্যই এখানে একমাত্র চালিকাশক্তি, সে সত্য নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দের সমর্থনই করুক বা বিরোধিতাই করুক। এমনকি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদও ঋষিদের মতে সাধারণ জ্ঞানমাত্র। সত্যানুসন্ধানী বৈজ্ঞানিক মানসিকতার সন্ধান পাই যখন সত্যের জন্য যে কোন মূল্য দিতে তাঁরা প্রস্তুত। নচেৎ কারাই বা সাহস করতেন নিজেদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থটিকেও সাধারণ জ্ঞান বা অপরা বিদ্যা বলে ঘোষণা করতে? একমাত্র ঔপনিষদিক চিন্তাধারা ছাড়া অন্য কোন ধর্মমতে এই সাহসিক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি লক্ষ্য করা যায় না। সাধারণত সব ধর্মমতেই নিজেদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থটি ছাড়া আর সবগুলিকেই সাধারণ জ্ঞানের অধীন বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু উপনিষদের সত্যানুসন্ধানী ঋষিগণ বিজ্ঞান, কলা ইত্যাদি বিদ্যার্জনের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা, এমনকি যে বেদবিদ্যার প্রতি তাঁদের অপরিসীম শ্রদ্ধা, সে সবগুলিকেই 'অপরা বিদ্যা' বলতে দ্বিধা করেন নি।

বর্তমানকালে শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় এই ভাবের প্রতিধ্বনি পাই—বেদ ইত্যাদি পবিত্র গ্রন্থে ঈশ্বর নেই ঈশ্বরের খবর আছে। পাঁজিতে বৃষ্টিপাতের খবর থাকে, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও জল পড়ে না। ঠিক তেমনি

গ্রন্থ ঘেঁটে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না, তাঁকে পাওয়া যায় নিজের অনুভূতির গভীরে, কারণ তিনি পরমাত্মা।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, উচ্চতর জ্ঞান বা পরা বিদ্যা কোন্ স্তরের জ্ঞান? এই আপাত ভ্রমাত্মক বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে গেছেন ঋষিগণ, তাঁদের মতে, এই দিকে বিশাল জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্র পড়ে রয়েছে যা এখনও গবেষণার অপেক্ষায়, তবে এই পথ সাধারণ থেকে একটু আলাদা।

"অথ পরা, যয়া তদক্ষরম অধিগম্যতে" (তদেব, ১/১/৫) 'এই পরা বিদ্যা, যার সাহায্যে অক্ষরপুরুষকে জানা যায়।' সমস্ত লৌকিক বিদ্যা ব্যস্ত বিনাশী তথা পরিবর্তনশীল বস্তুর অনুসন্ধানে। বৈজ্ঞানিক স্যার আর্থার এডিংটনের ভাষায় বিজ্ঞান আমাদের কাছে প্রতিটি বস্তুর বহিরঙ্গ রূপের জ্ঞান পৌঁছে দেয়, কিন্তু অন্তরের উপাদানের খবর দিতে পারে না। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় পবিত্র গ্রন্থরাজি ঈশ্বরের সংবাদ এনে দেয়, ঈশ্বরকে নয়। অথচ আমরা অনুভব করি, এডিংটনের ভাষায়, 'সমগ্র নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে লুক্কায়িত সেই অজানা উপাদান।' কি সেই উপাদান? কিভাবে পাব তাঁকে? যদি এই ভৌত বিষয়ের জ্ঞান আমাকে সেখানে পৌঁছে না দেয়, অন্য কোন অনুসন্ধানের পথ নিশ্চয়ই আছে যে পথ আমাদের সে সত্যে পৌঁছে দেবে।

যদি পবিত্র গ্রন্থরাজি শুধু ঈশ্বরের খবরটুকু দিতে পারে, তবে নিশ্চয়ই এমন কোন সাধনমার্গ আছে যাকে আশ্রয় করে আমরা ঈশ্বরের সন্ধান পাব, শুধু তাঁর সংবাদটুকু নয়। এই সাধনপথ পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে উপনিষদে, তাই উপনিষদ্ সাহিত্য হয়েও অমর। তাই ঐ অনুসন্ধানের গতিপ্রকৃতি ও চরিত্রও অনেকটা অভিনব, সিদ্ধান্তগুলিও অদ্বিতীয়। শুধু পছন্দসই কিছু মতবাদ নয় বা কোন এক ফতোয়া জারি করে তা অপরের ওপর চাপিয়ে দেওয়া নয়। এমনকি সত্যের এই অনুসন্ধানে ক্লান্তির বা

আলস্যের চিহ্নমাত্রও নেই। সত্যই একমাত্র লক্ষ্য।

'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্
সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।' (তদেব, ৩/১/৬)

—সত্যেরই জয় হয়, অসত্যের নয়। জ্যোতির্ময় সত্যের পথ সত্যের দ্বারাই আস্তীর্ণ।

জ্যোতির্ময় সত্যে পৌঁছবার এই পথে ছড়িয়ে রয়েছে কত আবর্জনা। সে আবর্জনা কখনও কতকগুলি পরিত্যক্ত ধারণার, কখনও নিজেদের পছন্দসই সব উদ্ভট মতবাদের ও যুক্তিহীন অসার ধ্যান-ধারণার। চিন্তার গতি কখনও এই বাধাতে আটকে থাকে নি, এগিয়ে গেছে দুই পায়ে ভর দিয়ে—একটি, নিত্যানিত্যবস্তু বিচার—অপরটি, নিরাসক্তি, বিবেক ও বৈরাগ্য। একমাত্র চালিকাশক্তি সত্যে পৌঁছবার একাগ্রনিষ্ঠা। অন্তর্জগৎ সম্পর্কে এক ঋষিকে দেখছি একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে, অপরজন তাকে যথেষ্ট মনে করেন না। ফলে অনুসন্ধান এগিয়ে চলে গভীরতর সত্যের সন্ধানে। প্রতিভাশালী মনগুলির তর্কবিচারের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে এই সানন্দ গবেষণা। সত্যের নব নব দিগন্ত উন্মোচিত হয় সেখানে কোন পৌরোহিত্যের অত্যাচার নেই, কোন দেশীয় বা জাতীয় গোঁড়ামি নেই। যতক্ষণ না সেই মৃত্যুঞ্জয় অক্ষরপুরুষের সঙ্গে পরমাত্মার আধ্যাত্মিক মিলন ঘটছে, ততক্ষণ চলেছে সেই আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান। আবিষ্কারের এই দীর্ঘ পথের শেষে এসে ঋষিরা দেখলেন যে সোপান বেয়ে তাঁরা উচ্চতম সত্যে এসে পৌঁছেছেন সে সোপানগুলিও কম প্রয়োজনীয় নয়। মানুষ এই সোপানগুলি বেয়ে এগিয়ে গেছে মিথ্যা থেকে সত্যে নয়, এক সত্য থেকে অন্য সত্যে, নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে।

৩২ ভারতের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য

এই প্রসঙ্গে ও এই পটভূমিকায় ভারতবর্ষের ধর্ম এক নতুন আঙ্গিকে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। উপনিষদের সময় থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ধর্মজগতে ভারত কখনই একটা গোঁড়া মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করে বসে থাকে নি, বরং এই মানুষ ও এই প্রকৃতির পেছনে সনাতন সত্যকে জানার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করে চলেছে। অভিজ্ঞতাগুলিকে বিশ্লেষণ করে সত্যকে জানবার এই যে ভারতীয় গবেষণা, উপনিষদ্ একেই লিপিবদ্ধ করেছে স্বর্ণাক্ষরে। এরই প্রশংসা করে আমেরিকান ধর্মপ্রচারক রবার্ট আর্নেষ্ট হিউম লিখছেন : (The Thirteen Principal Upanisads, p. 30, Footnote)

'উপনিষদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সত্যানুসন্ধানের একাগ্রনিষ্ঠা।'

উপনিষদের ঋষিবৃন্দ মানুষের অন্তর্জগতের গভীরে অনুসন্ধান চালিয়েছেন সূক্ষ্মবুদ্ধি বা সূক্ষ্মবিচারের সাহায্যে। এই বিচারধারা তাঁরা লাভ করেছেন দীর্ঘ সাধনার মধ্য দিয়ে, যার সম্বন্ধে কঠোপনিষদের ভাষায় (১/৩/১২) বলা হচ্ছে : *"অগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ"*— একাগ্র ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিসহায়ে সূক্ষ্মদর্শিগণের সাধনার দ্বারা এই সত্যে উপনীত হয়েছেন যে এই অক্ষয় সত্যটিই একমেবাদ্বিতীয়ম্। ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকে এই মহান সত্যটি ঘোষিত হয়েছে এবং এরই অনুপ্রেরণা স্পর্শ করেছে 'গীতা' মহাগ্রন্থের দার্শনিক বিচারধারাকে ও আরও বহু আধ্যাত্মিক পথের সাধকজনকে। *ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'*—সমগ্র বিশ্বচরাচর ও তার বিচিত্র রূপ ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত। কঠোপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীর দ্বিতীয় শ্লোকটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য শুরু করছেন অনেকটা এইভাবে, 'আত্মা ব্যষ্টিশরীরের অন্তঃপুরেই শুধু বাস করেন, তা নয়—তিনি প্রকাশমান

সমস্ত অস্তিত্বের অন্তরাত্মায়।'

'হংসঃ শুচিষৎ বসুরন্তরিক্ষসৎ হোতা
বেদিষৎ অতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষৎ বরসৎ ঋতসৎ ব্যোমসৎ অব্জা গোজা
ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥' (কঠ ২/২/২)

—সূর্যলোকে তিনি হংস, চরাচর-পরিপূর্ণ বায়ু, যজ্ঞবেদীর অগ্নি, আবার গৃহস্থের মাননীয় অতিথি। তিনি মানুষে, দেবতায়, যজ্ঞাদিকর্মে আবার অনন্ত আকাশে। তিনি জলজ, আবার ভূমিজ। যজ্ঞাদিকর্মের ফল যেমন তিনি, আবার পর্বতজাত স্রোতস্বিনীও তিনিই। তিনি সত্য, আবার তিনি অনন্ত।

এই অপূর্ব কাব্যাংশ গভীর আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচায়ক। ঋগ্বেদেও (৬/৪০/৫) এটি রয়েছে, যদিও শেষের শব্দটি বাদ দিয়ে। প্রকৃতির দিকে ভারত এইভাবেই তাকিয়েছে—প্রকৃতির মাঝেই উদ্ভিদবিদ্যা, জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি ও মানুষের তৈরি এই পরিবেশ সব কিছুকেই ভারত দেখতে চেয়েছে বন্ধুর দৃষ্টিতে ও সেইভাবেই ব্যবহার করতে চেয়েছে প্রকৃতিকে ; পাশ্চাত্যের মতো শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের মনোভাব নিয়ে নয়। শত্রুর মনোভাব থাকলে মানুষ প্রকৃতির ওপর চালায় লুণ্ঠন ও দস্যুতা। এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে ছড়িয়ে পড়ে, নিয়ে আসে যুদ্ধ, নিয়ে আসে সাম্রাজ্যবাদ ও দাসব্যবসা। এই মনোভাব থেকেই নষ্ট হয় প্রাকৃতিক ভারসাম্য। তারপর একদিন প্রকৃতি শোধ নেয় মানুষের এই দস্যুতার বিরুদ্ধে। আধুনিক মানুষের সামনে ইতোমধ্যেই হাজির হয়েছে সেই দুঃসময় আর মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানের জয়যাত্রা ইতোমধ্যেই সেই কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন।

৩৩ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই ঐক্য

যুদ্ধোত্তর কালের যে পাশ্চাত্য সেখানে ক্রমশ একদা চিন্তাশীল মনীষী ও বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের গবেষণায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ঐক্যের কথা বিবেচনা করতে শুরু করেছেন। তাঁদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। প্রাচুর্যের অর্থনীতি আজ সমালোচিত, জাতীয় আয়বৃদ্ধির সরকারী সূচক আজ আর দেশের সঠিক অর্থনীতির পরিচায়ক নয়, অন্যদিকে চলেছে জৈবিক সুখের অসংযত মাত্রাবৃদ্ধি, প্রকৃতির ওপর অবাধ লুণ্ঠন, এই পটভূমিকায় দেখছি নতুন নতুন বই পাশ্চাত্যে লেখা হচ্ছে প্রকৃতিকে নিয়ে, যেখানে উপনিষদ্ থেকে উদ্ধৃত করে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গির কথাও বলা হচ্ছে। এমন একটি আধুনিক বইয়ের নাম The Secret Life of Plants, লেখক পিটার টম্‌পকিন্‌স ও ক্রিস্টোফার বার্ড। এই বইয়ের একটি অধ্যায়ের শিরোনাম এই রকম ঃ 'উদ্ভিদ ও মানুষের জৈবিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সম্পর্কের ওপর অভূতপূর্ব আবিষ্কারনিচয়'। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য দেশে এই বিষয়ে যে মূল্যবান গবেষণাগুলি হয়েছে তারই এক আকর্ষণীয় বিবরণ আমরা এই বইতে পাই। বইয়ের ভূমিকা থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে ঃ

'এতদিন কবি ও দার্শনিকের যে দৃষ্টি আমাদের জানাত যে উদ্ভিদ এক প্রাণবন্ত অস্তিত্ব, এক একটি ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, এমনকি সে সংবাদ আদানপ্রদানেও সক্ষম, আজ সেই দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে সত্য বলে প্রমাণিত। আমাদের অন্ধ দৃষ্টি আমাদের সেই সত্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে ও আমরা উদ্ভিদকে এক স্বয়ংক্রিয় বস্তুমাত্র ভেবে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি।'

আমাদের ভারতবর্ষের মানুষদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ এই বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়। ঐ অধ্যায়ের নাম 'উদ্ভিদজীবনের ঘটনাগুলির দশ কোটিগুণ

বর্ধিতকরণ'। প্রায় সাত, আট দশক আগে স্বর্গীয় জগদীশচন্দ্র বসু যে গবেষণাগুলির সূত্রপাত করেছিলেন, তারই বিস্তৃত বিবরণ আমরা পাই এই অধ্যায়ে। কলকাতার 'বোস ইনিস্টিটিউট'-কে লেখকেরা 'ভারতের বিজ্ঞানমন্দির' নাম দিয়েছেন, কারণ ঐ 'বসু বিজ্ঞানমন্দির'-এর প্রবেশদ্বারে উৎকীর্ণ রয়েছে এই কথাগুলি—'সমগ্র পৃথিবীর কল্যাণের উদ্দেশ্যে ও ভারতকে সম্মানিত করার মহৎ উদ্দেশ্যে এই মন্দির ঈশ্বরপাদপদ্মে নিবেদিত হলো।'

বৈজ্ঞানিক বসু কলকাতার একটি ছোট কুড়ি ফুটবর্গের ঘরে নিজের যন্ত্রপাতি নিজে তৈরি করে নিয়ে পদার্থবিদ্যায় গবেষণা শুরু করেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি আবিষ্কার করেন বেতার-তরঙ্গ। নিজের অগোচরেই পদার্থবিদ্যার গবেষণা থেকে উদ্ভিদ বিদ্যা ও শারীরতত্ত্বের গবেষণায় তিনি প্রবেশ করেন। যখন তিনি দেখলেন নিষ্প্রাণ ধাতুখণ্ড—সপ্রাণ উদ্ভিদ ও মানুষের মাঝের সীমারেখা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, প্রকৃতির এই আপাত বৈচিত্র্যের মধ্যে এক বিরাজমান ঐক্যের যেন তিনি সন্ধান পেলেন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের ১০ মে লণ্ডনের রয়েল ইনস্টিটিউশনে তিনি তাঁর আবিষ্কৃত সত্যের সমর্থনে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সকলের সামনে করে দেখান ও বক্তৃতা করেন। দর্শক-আসনে ছিলেন সন্দেহপ্রবণ, যুক্তিবাদী অথচ সত্যানুসারী বৈজ্ঞানিক-গোষ্ঠী, বক্তৃতার শেষভাগে তিনি বললেন ঃ (The Secret Life of Plants, pp. 86-87)

"আজ সন্ধ্যায় এইমাত্র আপনাদের সামনে সপ্রাণ ও নিষ্প্রাণ—এই উভয় প্রকার অস্তিত্বের ওপর যে কোন শক্তিপ্রয়োগের ফলস্বরূপ যে বিকৃতি ঘটে তা চাক্ষুষ দেখালাম। যে লেখচিত্রগুলি আমার যন্ত্রে ফুটে উঠেছে সেগুলি লক্ষ্য করুন, কতটাই না একধরনের। এতটাই একরকম যে, আপনি একটি থেকে অপরটি আলাদা করতে পারবেন না। কাজেই পদার্থ ও জীবদেহ—উভয়কে আলাদা করবেন কিভাবে? প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে সুনিশ্চিত

কোন সীমারেখা নেই। তাই এই লেখচিত্রগুলির সামনে যখন নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম ও লক্ষ্য করছিলাম সেই সর্বব্যাপী ঐক্যের ভাবনাকে— যে ঐক্য বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে আলোর তরঙ্গে, প্রাণের স্পন্দনে, জ্যোতির্ময় সূর্যতারকার প্রকাশে, তখন প্রথম অনুভব করলাম সেই পরম সত্যের কথা যা উদ্‌গীত হয়েছিল গঙ্গাতীরে আমার মহান পূর্বপুরুষদের কণ্ঠে আজ থেকে তিন হাজার বছর আগে। কি সেই বাণী? 'যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যদর্শনে সক্ষম, তিনিই শাশ্বত সত্যের দ্রষ্টা—অন্য কেউ নয়, না— অন্য কেউ নয়'।"

বৈজ্ঞানিক বসু ১৯১৯ ও ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর ইউরোপ ভ্রমণকালে যখন এই বৈপ্লবিক আবিষ্কারগুলি উপস্থাপিত করেন, তখন সেগুলির প্রতি পাশ্চাত্য প্রতিক্রিয়ার ধরন উল্লেখ করতে গিয়ে লেখকেরা উদ্ধৃত করেছেন 'টাইমস অব লণ্ডন'-এর মত স্বভাব-সংযত পত্রিকা থেকে ঃ (তদেব, পৃঃ ৯৪)

'ইংল্যাণ্ডে যখন আমরা বর্বর জীবনের কয়েকটি স্থূল ঘটনার বিচারেই আবদ্ধ ছিলাম, তখন এই সূক্ষ্মদর্শী প্রাচ্যদেশীয় মানুষটি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে একসূত্রে মেলাতে পেরেছেন ও প্রকাশিত করেছেন এই পরিবর্তনশীল বৈচিত্র্যের মূলগত ঐক্যকে।'

গ্রন্থটির উপসংহারে লেখকেরা লিখছেন ঃ

'ঋষিদের এই অতীন্দ্রিয় জগতের আকর্ষণ বা অন্তর্জগতের আকর্ষণ ব্যাপারটি এমন একটা মহত্তর জায়গা নিয়ে রয়েছে যে একে অগ্রাহ্য করা যায় না কারণ ঝুঁকি অনেক বেশি হয়ে পড়ে। এর কারণ আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই পৃথিবীর অস্তিত্ব এই ধারণার ওপরই নির্ভরশীল। উদ্ভিদজগতের এই রহস্যগুলি যখন আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের হতবুদ্ধি করে দিচ্ছে, তখন এই তাত্ত্বিক বিতর্কের ঊর্ধ্বে ঋষিদের সমাধানটি অবিশ্বাস্য হলেও আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। শুধু তাই নয় তাঁদের সমাধান সমগ্র জীবনচক্রের এক দার্শনিক অর্থ এনে দেয়।'

৩৪ বিজ্ঞান ও ধর্মের পারস্পরিক পরিপূরণ

ধর্মকে যদি যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিই অথবা ঐভাবে যুক্তির দ্বারা প্রমাণিত হবার ক্ষমতা নিয়ে ধর্ম আমাদের মধ্যে উঠে আসে, তখন সে ধর্মের একটি বাণী আমরা পাই সে বাণী সমগ্র মানবসমাজের জন্যে। হয়তো ভৌতবিজ্ঞান তার কারিগরি কলাকৌশলের সাহায্যে রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি আধুনিক সরঞ্জাম দিয়ে আমাদের ঘরবাড়ি সাজিয়ে দিতে পারে, হয়তো আধুনিক কল্যাণকামী রাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তার সবরকম ব্যবস্থা মানুষের কাছে পৌঁছে যায় ও মানুষের জীবন সুখে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, হয়তো পরকালের সুখ, শান্তির নিরাপত্তাও প্রতিষ্ঠিত হয় কোন কোন ধর্মমতের ব্যবস্থাপনায়, এমনকি মানুষ তার বাড়ির নামকরণও করে—'শান্তি কুঞ্জ' অথবা 'সুখ-বিলাস'। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এই সব শর্তগুলি পালিত হলে সে ঐ শান্তি কুঞ্জে সুখশান্তিতে থাকবে। কারণ শান্তি পেতে গেলে তার জন্যে যে মানসিক শক্তি ও মানসিক পুষ্টি প্রয়োজন, তার জন্যে অন্য একধরনের জ্ঞানার্জন ও অন্য একধরনের চর্চা অত্যাবশক, যার নাম 'ধর্ম'।

মানুষ যদি বাইরের পরিবেশকে সুস্থ রাখে ভৌতবিজ্ঞান ইত্যাদি বহির্বিজ্ঞানের সহায়তায় ও অন্তর্জগতের পরিবেশকে সুস্থ রাখে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাহায্যে, তবেই মানুষের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে, অন্যভাবে নয়। এইটিই ঔপনিষদিক সত্য।

কিন্তু এইটিই তো আধুনিক সভ্যজগতের প্রতিচ্ছবি নয়। এই যান্ত্রিক সভ্যতার বাতাবরণে, এই বহির্জগতের অর্থ, ঐশ্বর্য, ভোগসুখের মাঝখানে মানুষ ক্রমশ ভেতর থেকে দরিদ্র হয়ে পড়ছে, এক শূন্যতার শিকার হয়ে উঠছে। শিশু-অপরাধ, আত্মহত্যা, মদ ইত্যাদি নেশার দাসত্ব সমাজে বেড়েই চলেছে। সেইসঙ্গে সমাজে ব্যক্তিত্বের সংকট ও নানা সামাজিক ব্যাধি যেন বেড়েই চলেছে। কেন? কারণ মানুষ অন্তরে দুঃখী, একাকী

ও ইন্দ্রিয়সুখ-নির্ভর। ভারতের চিন্তাশীল দার্শনিকবৃন্দ এই বিপত্তির কথা আগে থেকেই ভেবেছেন। তাই সুপ্রাচীন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাই ঃ (৬/২০)

'যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥'

—যদিও মানুষ তার কারিগরি কলাকৌশল দিয়ে এই বাইরের পরিবেশকে এক টুকরো চামড়ার মতো নিজ আয়ত্তে হয়তো গুটিয়ে আনতে পারে, কিন্তু জ্যোতির্ময় অন্তরাত্মার উপলব্ধি ছাড়া তার দুঃখের নিবৃত্তি অসম্ভব।

একশো বছর আগে দার্শনিক শোপেনহাওয়ার বললেন ঃ (The World as will and Idea, Vol I, p. 404)

'যে সব মানুষ বাইরের প্রয়োজনীয়তা থেকে নিজেকে নিরাপদ করে তুলতে পেরেছে, সব রকমের বাইরের বোঝা ছুঁড়ে ফেলেছে, সেইসব মানুষের কাছে তারা নিজেরাই নিজেদের এক বোঝা।'

৩৫ ধর্ম এক উপলব্ধি

আধুনিক মানুষের কাছে সে নিজেই এক বড় বোঝা ও সমস্যা। নিজেকে নিয়ে তার যে সমস্যা সেটা আরও বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল, আরও কারিগরি কায়দা ; জীবন উপভোগের নানা উপকরণ এসব কিছু দিয়েও সে সমাধান করতে পারছে না। নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়ে, মনুষ্যজীবনের নানা জৈবিক অবস্থানকে বদলে দিয়ে কোনভাবেই সে এই সমস্যা দূরীভূত করতে পারছে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আশ্রয় নিচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই প্রসঙ্গে বলছেন ঃ (বাণী ও রচনা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩২)

'আপনারা মনে রাখবেন, শুধু কথা বলায় ধর্ম নেই বা গ্রন্থের মধ্যেও

নেই—ধর্ম অপরোক্ষানুভূতি। ধর্ম কোনরূপ বিদ্যার্জন নয়, ধর্ম আদর্শস্বরূপ হয়ে যাওয়া।'

ভারতবর্ষ ধর্মকে বুঝেছে এই দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এই সারসত্যটিই স্বামীজী প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর বজ্রনির্ঘোষকণ্ঠে। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ ধর্মের লক্ষ্যটিকে স্থাপন করেছিলেন ঈশ্বরোপলব্ধির অত্যুচ্চ আদর্শে। এই লক্ষ্যে মানুষ পৌঁছতে পারে তার আধ্যাত্মিক চেতনার ঊর্ধ্বায়নের মধ্য দিয়ে। ঐ অত্যুচ্চ আদর্শটি হলো ধর্মের পরশপাথর যা মানুষের ভেতরের সত্তাকে সোনা করে দেয়। ধাপে ধাপে মানুষ এই আদর্শের দিকে এগিয়ে চলে, যেমন একটি ছোট চারাগাছ আস্তে আস্তে বড় হয়ে ওঠে বা যেমন প্রাসাদ গড়ে ওঠে একটির পর একটি ইট গেঁথে। আমরা যখন জীবনে এই ধর্মসাধনাকে গ্রহণ করি, অন্তরে এক শক্তিলাভ করি, চেতনা আমাদের বিস্তৃত হতে থাকে, সহানুভূতির ভাব আর ছোট বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে না। আমরা তখন অনুভব করি যে, আমরা পূর্ণতর মানুষ হয়ে উঠছি। এই যে আধ্যাত্মিক বিকাশ এর থেকেই আসে শক্তি যা বহির্বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি আবিষ্কার, প্রত্যেকটি কলাকৌশলকে নিজের আয়ত্তে রাখতে পারে। এই শক্তির সাহায্যেই মানুষ জীবনের নানা বিশৃঙ্খল শক্তিকে শান্তি ও কল্যাণের পথে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়। মানবসমাজ থেকে এই ধর্মসাধনা যদি সরিয়ে নিই, তাহলে বর্বরোচিত স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

অনেক প্রাচীন সভ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে অসভ্য বর্বরদের হাতে, যারা ঐ সভ্যতার আস্বাদটুকু পায় নি। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা যদি এগিয়ে চলে ধর্মসাধনাকে অগ্রাহ্য করে, তবে যে বর্বরদের হাতে তার মৃত্যু ঘটবে তারা কিন্তু এই সভ্যসমাজের মধ্যেই বড় হয়ে উঠবে তাদের মারণাস্ত্র নিয়ে। এই ভয়ঙ্কর পরিণাম থেকে মুক্তি দিতে পারে, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের ভাষায় একটু 'খ্রীস্টান-সুলভ প্রেম' যা আমাদের প্রতিবেশীর কথা ভাবায়।

(Impact of Science on Society, p. 114) ঐ একই কথা পাই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পিটিরিম. এস. সোরোকিনের বক্তব্যে, যখন তিনি প্রত্যেকটি ব্যক্তিত্বে পরার্থপরতার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। এই প্রেমের উদ্ভব হয় ধর্মসাধনার মধ্য দিয়ে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের শিক্ষক স্বামী বিবেকানন্দ তাই ধর্মের সংজ্ঞা দিলেন আধুনিক বিজ্ঞানের পরিভাষায় ঃ (বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪০০)

'ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভেতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম থেকেই বর্তমান, তারই প্রকাশ।'

এই প্রসঙ্গে সচরাচর যে প্রশ্ন উঠে আসে, 'ধর্মের দ্বারা কি প্রকৃতপক্ষে কোন ফল হয়?' স্বামী বিবেকানন্দ সেই প্রশ্নটি উত্থাপন করে তার উত্তর দিতে এগিয়ে এসেছেন ঃ (তদেব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০)

"হ্যাঁ, হয় ; ওতে মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করে। মানুষ বর্তমানে যা, তা এই ধর্মের শক্তিতেই হয়েছে, আর সেটাই এক মানুষ নামের প্রাণীকে দেবতা করবে। ধর্ম তা করতে সমর্থ। মানবসমাজ থেকে ধর্ম বাদ দাও—কি অবশিষ্ট থাকবে? তা হলে এই সংসার শ্বাপদ সমাকীর্ণ অরণ্য হয়ে যাবে। ইন্দ্রিয়সুখ মানবজীবনের লক্ষ্য নয়, জ্ঞানই সকল প্রাণীর লক্ষ্য। আমরা দেখতে পাই, পশুরা ইন্দ্রিয়সুখে যতটা প্রীতি অনুভব করে, মানুষ বুদ্ধিশক্তি পরিচালনা করে তার চেয়ে বেশি সুখ অনুভব করে থাকে ; আর এটাও আমরা দেখতে পাই, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির পরিচালনার চেয়ে আধ্যাত্মিক সুখে মানুষ অধিকতর সুখবোধ করে থাকে। অতএব অধ্যাত্মজ্ঞানকে নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলতে হবে। এই জ্ঞানলাভ হলে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ আসবে।"

৩৬ ক্রমবিকাশে 'হোমোষ্ট্যাসিসে'-র বৈশিষ্ট্য

প্রকৃতি মানুষকে সেই জৈবিক ক্ষমতা দিয়েছে যাতে সে তার চারপাশের জগৎকে ও নিজেকে বুঝতে পারে। উচ্চস্তরের স্তন্যপায়ী জীব থেকে

মানুষ পর্যন্ত ক্রমবিকাশের ধারায় প্রকৃতি এই জৈবিক ক্ষমতাকে ক্রমশ পূর্ণতর করে তুলেছে। জীবদেহের অন্তর্যন্ত্রগুলি আগে চলছিল তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রিত পার্থক্যের ফলে যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'থার্মোষ্ট্যাটিক' বলা চলে, মানুষে এসে জটিল অন্তর্যন্ত্রগুলির সুষম সমন্বয় ঘটেছে নানা জৈবিক পরস্পরনির্ভরতার মাধ্যমে যাকে জীববিজ্ঞানীদের ভাষায় 'হোমোষ্ট্যাটিক' বলা যায়, জীবদেহের অন্তর্যন্ত্রগুলির এই ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে স্নায়ুতত্ত্ববিদ গ্রে ওয়াল্টার বললেন : (The Living Brain, p. 16)

'শরীরের ভেতরের তাপমাত্রার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা বা 'থার্মোষ্ট্যাসিস' নিঃসন্দেহে জীবজগতের ইতিহাসে একটি বড় ঘটনা। এই কারণেই তার সৃষ্টির আদিযুগ থেকে পৃথিবী ক্রমশ শীতলতর হয়ে গেলেও স্তন্যপায়ী জীব বিলুপ্ত হয় নি। ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যদিও এই সাধারণ ঘটনার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও ঘটেছে। সেটা হলো এই যে মস্তিষ্কের এক অংশে সমস্ত অন্তর্যন্ত্রের এক স্বয়ংক্রিয় সুষম সমন্বয়ব্যবস্থা প্রকৃতি গড়ে তুলেছে ধীরে ধীরে। এই জৈবিক ঘটনার নামকরণ করা হয়েছে 'হোমোষ্ট্যাসিস'। এর ফলে অন্তর্যন্ত্রগুলির স্বয়ংক্রিয় পরিচালনা ছাড়াও মস্তিষ্কের অনেকটাই মুক্ত থাকছে অন্যান্য চিন্তা ও কাজের জন্যে।'

শারীরতত্ত্ববিদ ক্লড্ বার্ণার্ডের 'একটি নির্দিষ্ট আন্তর-সামাজিক পরিবেশই স্বাধীন জীবনের সর্ত'—এই অর্থব্যঞ্জক কথাগুলি উদ্ধৃত করে গ্রে ওয়াল্টার, আরো বলেন : (তদেব, পৃঃ ১৬-১৭)

"এই তত্ত্বটির ব্যাখ্যা ও শারীরতত্ত্বের গবেষণায় এই তত্ত্বের প্রয়োগ বিষয়ে আমরা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার জোসেফ বারক্রফ্‌টের কাছে অনেকাংশে ঋণী। আর তা যদি না করি, তাহলে ঐ তত্ত্বটিকে আমাদের সম্পূর্ণ তাচ্ছিল্য করা ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না, কারণ 'মুক্ত জীবন'

কথাটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নয়। তিনি কতকগুলি সহজ প্রশ্ন উত্থাপন করে তার সমাধানে আমাদের পথনির্দেশ দেন।

"তিনি প্রশ্ন তুললেন, 'তাপমাত্রাকে এক জায়গায় স্থির রেখে, হাইড্রোজেন-আয়নের মাত্রাকে স্থির রেখে বা জল, শর্করা, অক্সিজেন, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির মাত্রা স্থির রেখে প্রাণীর লাভটা কি?' প্রত্যেকটি পরিমাণগত উপস্থাপনার ব্যাপারে তিনি অদ্বিতীয়—তাই সারাদিন ধরে তিনি দেখিয়ে চললেন কিভাবে প্রত্যেকটি শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়ার সঙ্গে অপর একটি শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়া পারস্পরিকভাবে নির্ভরশীল। আমার এখনও মনে আছে যে, তিনি এই বিষয়টির উপস্থাপনা ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হোমোষ্ট্যাসিসের ভূমিকা আলোচনা করতে লাগলেন তাঁর চিন্তাকে বহু দূর প্রসারিত করে, কিন্তু আমরা লক্ষ্য করলাম তিনি একটু বিনয়ী, একটু যেন সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন পাছে আমরা তাঁকে উপহাস করি। তিনি বলতে লাগলেন, 'একটা দীঘির স্থির জলে কতসময়ই দেখেছি ঢেউ উঠতে যখন একটা নৌকা বয়ে যায়। লক্ষ্য করেছি, দুপাশ থেকে ওঠা দুটি ঢেউ যখন মেলে তখন কত সুন্দর একটি ছন্দই না ফুটে ওঠে...অবশ্য দীঘির জলকে কিন্তু থাকতে হবে সম্পূর্ণ স্থির। পরিমণ্ডল যদি শান্ত না হয় তাহলে উচ্চতর বৌদ্ধিক বিকাশ অনুসন্ধান করা মানে অনেকটা তরঙ্গ-সংকুল আটলান্টিক মহাসাগরে ছন্দোবদ্ধ ঢেউ অনুসন্ধানের সামিল।'"

অন্তরের দৃঢ়বদ্ধ সামাজিক পরিব্যাপ্তিতে হোমোষ্ট্যাসিস শেষ হয়ে যায় না। এটি একটি প্রাথমিক শর্ত যাকে আশ্রয় করে জীবন ক্রমবিকাশের স্তর ধরে এগিয়ে চলতে পারে। এই চলা মানুষকে উচ্চতম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে যখন মানুষ পায় পূর্ণমুক্তির স্বাদ, জৈবিক সীমা অতিক্রম করে নিজ স্বরূপের উপলব্ধি হয় করায়ত্ত। প্রকৃতি মানুষকে দিয়েছে জৈবিক হোমোষ্ট্যাসিস, মানুষ এই প্রকৃতিদত্ত জৈবিক শক্তির সাহায্যে জয় করতে চলেছে মানসিক হোমোষ্ট্যাসিস। বেদান্ত মনের

পেছনে যে শাশ্বত আত্মার কথা বলে, সে আত্মার উপলব্ধি এই মানসিক হোমোষ্ট্যাসিস-এর দ্বারাই সম্ভব। হোমোষ্ট্যাসিসের মধ্য দিয়ে এই যে বন্ধনমুক্তি এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গ্রে ওয়াল্টার বলছেন, 'মস্তিষ্কের নিম্নাংশ ব্যস্ত থাকে শরীরের অন্তর্যন্ত্রগুলি নিয়ন্ত্রণে, অপরদিকে মস্তিষ্কের উপরাংশ এই কাজগুলি থেকে মুক্ত থাকে।' তিনি আরও দেখালেন, স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রে যেখানে হোমোষ্ট্যাসিস তাকে জৈবিকভাবে টিকিয়ে রাখে মাত্র, মানুষের ক্ষেত্রে সেখানে হোমোষ্ট্যাসিস আনে তার আধ্যাত্মিক মুক্তি।

৩৭ হোমোষ্ট্যাসিস ও যোগসাধনা

দৈহিক স্তরের হোমোষ্ট্যাসিস-এর সঙ্গে মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্তরে বিকশিত যে হোমোষ্ট্যাসিস তাকে সম্পর্কিত করে গ্রে ওয়াল্টার সিদ্ধান্ত করলেন ঃ

'নতুন দিগন্ত আমাদের সামনে যখনই উন্মোচিত হলো, আমরা আমাদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলাম। প্রায় দুই থেকে তিন হাজার বছর আগে আমরা এই হোমোষ্ট্যাসিসের অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করেছি নানা মানুষের মধ্যে নানাভাবে। সেই অভিজ্ঞতা তাঁদের মস্তিষ্কে এক পরিণত সাম্যাবস্থা নিয়ে আসত। যোগী যে "নির্বাণ" অবস্থায় পৌঁছতে পারতেন, সে অবস্থায় ঐ শারীরিক পরিবর্তন লক্ষণীয়। ঐ অবস্থায় এক বোধাতীত শান্তি, এক স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ তার মধ্যে বিকশিত হয়—যে শারীরিক ও মানসিক সাম্যাবস্থায় বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা বা ব্যাধি এক যান্ত্রিক স্খলন এবং ত্রুটিমাত্র।'

সব জৈবিক বাধা অতিক্রম করে আত্মোপলব্ধির স্বাধীনতায় মুক্ত হবার যে আকুলতা, যে সংগ্রাম, তাকে অনুসরণ করতে হলে প্রথম দরকার নৈতিক জীবনের এক দৃঢ় ভিত্তি। এই ভিত্তি থাকলে মানুয তার সংগ্রামকে অন্তর্জগতে নিয়ে যেতে পারে যেখানে তাকে এগোতে হবে

শক্তিশালী মন ও শুদ্ধ বুদ্ধির সহায়ে। তা শরীর ও মনের শক্তি যখন এইদিকে নিয়োজিত হবে, তখন ঘটবে দ্বিতীয় স্তরের হোমোষ্ট্যাসিস। এই দ্বিতীয় স্তরের হোমোষ্ট্যাসিস-এর কথা আমরা আগেই বলেছি, যখন জৈবিক বাধা অতিক্রম করে মানুষ তার মস্তিষ্কের উচ্চতর অংশকে ক্রিয়াশীল করে তুলতে পারে। বেদান্তশাস্ত্র ও যোগশাস্ত্রে এই দ্বিতীয় স্তরের হোমোষ্ট্যাসিস-কেই বলা হয় 'শম' ও 'দম', মন এবং ইন্দ্রিয়নিচয়ের সংযম, কঠ উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ে একটি রথের উপমা দিয়ে বিষয়টি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে মানুষের বিবেকবুদ্ধিরূপ সারথি আছে এবং বল্গাস্থানীয় মন যাঁর অধীন, তিনিই সেই পূর্ণতার, সেই পরম মুক্তির আস্বাদ পেতে পারেন।

৩৮ যোগাবস্থার প্রকৃতি

যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করে মন একটি পবিত্র ও শান্ত অবস্থা লাভ করে, সেই সাম্যাবস্থাকে বলা হয় 'যোগ'। মনের এই অবস্থাটি লাভ করার জন্যে আধ্যাত্মিক পথের পথিকেরা চেষ্টা করে চলেছেন যুগ যুগ ধরে। তাঁদের মধ্যে অনেকে সফল হয়েছেন, পরমাত্মাকে উপলব্ধি করেছেন নিজের হৃদয়কন্দরে। গীতামুখে শ্রীকৃষ্ণ এই সত্যটি অনুমোদন করেছেন নিম্নলিখিত শ্লোকে ঃ (৪/১০)

'বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥'

—বিষয়াসক্তি, ভয় ও ক্রোধবর্জিত ব্যক্তিরা আমাতে (সর্বভূতান্তরাত্মা যে আমি) একাগ্রচিত্ত ও আমাকে আশ্রয় করে জ্ঞান ও তপস্যাদ্বারা শুদ্ধ হয় এবং অনেকেই আমার ভাব অর্থাৎ সাযুজ্য লাভ করে।

এই একই সত্য অনুমোদন করছেন গৌড়পাদ তাঁর মাণ্ডূক্য-উপনিষদ্-কারিকায় ঃ (২/৩৫)

'বীতরাগভয়ক্রোধৈঃ মুনিভিঃ বেদপারগৈঃ।
নির্বিকল্পো হ্যয়ং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমোহদ্বয়ঃ ॥'

—যে আসক্তিশূন্য ভয় ও ক্রোধবর্জিত ঋষিগণ বেদজ্ঞানকে অতিক্রম করেছেন (অর্থাৎ পুস্তক-নির্দেশিত পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পেরিয়ে আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করতে পেরেছেন) তাঁরাই একমাত্র আপেক্ষিক অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় অদ্বৈত স্তরে উঠতে পারেন।

উপনিষদের সময়ে অর্থাৎ প্রায় চার হাজার বছর আগে অথবা হয়তো তারও আগে আমাদের দেশে এই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চর্চা পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করেছিল, যার অপর নাম 'যোগ'। এই প্রসঙ্গে কঠোপনিষদে বালক নচিকেতাকে উদ্দেশ্য করে যমের উক্তি স্মরণ করছি : (২/৩)

'যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্ ॥ ১০
তাং যোগমিতি মন্যন্তে...'

—যে অব্যবস্থায় মনের সঙ্গে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যাপারশূন্য হয় এবং বুদ্ধিও স্বকার্যে ব্যাপৃত হয় না, সেই অবস্থাকেই জ্ঞানিগণ উত্তম গতি বলে থাকেন। ...তাকেই যোগিগণ যোগ-শব্দে অভিহিত করেন।

৩৯ বেদান্তের দৃষ্টিতে ধর্ম ও বিজ্ঞান

প্রাচীন সভ্যতা ভৌতবিজ্ঞান ও কারিগরি কলাকৌশলকে কম প্রাধান্য দিয়েছে—অন্যদিকে আধুনিক সভ্যতা অত্যন্ত বেশি প্রাধান্য দিয়ে বসে আছে। আজ বিজ্ঞানকে প্রকৃত প্রেক্ষাপটে দেখবার সময় এসেছে। প্রকৃত প্রেক্ষাপট বলতে সমগ্র মানবজাতির জ্ঞানরাশি ও মানুষের কল্যাণের কথা বোঝায়। আধুনিক চিন্তাধারায় এই বিষয়ে একটি বড় অবদান লক্ষ্য করা যায় স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম ও পাশ্চাত্যদেশীয়

বিজ্ঞান পরস্পরকে যে পরিপূর্ণ করতে পারে, এই বিষয়টি তিনি ব্যাখ্যা করেন তাঁর 'মদীয় আচার্যদেব' বক্তৃতায়। এটি তিনি দিয়েছিলেন ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে নিউ ইয়র্কে ঃ (বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭৭)

'এই উভয় ভাবেরই মহত্ত্ব আছে, উভয় ভাবেরই গৌরব আছে। বর্তমান সমন্বয়ে এই উভয় আদর্শের সামঞ্জস্য, উভয় আদর্শের মিলন হবে। পাশ্চাত্য জাতির নিকট যেমন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ সত্য, প্রাচ্য জাতির নিকট আধ্যাত্মিক জগৎ তেমনি সত্য। প্রাচ্য জাতি যা কিছু চায় বা আশা করে, যা থাকলে জীবনটাকে সত্য বলে মনে হয়, আধ্যাত্মিক স্তরেই সে তা পেয়ে থাকে। পাশ্চাত্য জাতির চোখে সে স্বপ্নমুগ্ধ ; প্রাচ্য জাতির নিকট পাশ্চাত্যও সেরূপ স্বপ্নমুগ্ধ বলে প্রতীয়মান হয়—পাঁচ মিনিটও স্থায়ী নয় এমন পুতুল নিয়ে সে খেলা করছে! আর যে মুষ্টিমেয় জড়বস্তুকে এখন বা তখন ছেড়ে যেতে হবে, তাকেই বয়স্ক নরনারীগণ এত বড় বলে মনে করে—তা ভেবে প্রাচ্য হাসছে। একে অন্যকে স্বপ্নবিলাসী বলে থাকে।

'কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শ মানবজাতির উন্নতির পক্ষে যেমন দরকার, প্রাচ্য আদর্শও সেরকম ; আর আমার মনে হয়, পাশ্চাত্য আদর্শের চেয়ে তা বেশি প্রয়োজনীয়। যন্ত্র কখনো মানুষকে সুখী করে নি। কখনো করবেও না। যে আমাদেরকে বিশ্বাস করাতে চায় যে যন্ত্র আমাদের সুখী করবে, সে জোর করে বলে—যন্ত্রেই সে সুখ আছে ; কিন্তু সুখ চিরকাল মনেই আছে। যে মনের ওপর প্রভুত্ব করতে পারে, সেই কেবল সুখী হতে পারে, অন্যে নয়। আর এই যন্ত্রের শক্তিই বা কি? যে লোক তারের ভেতর দিয়ে তড়িৎপ্রবাহ পাঠাতে পারে, তাকে খুব মহৎ ও বুদ্ধিমান বলব কেন? প্রকৃতি কি প্রতিটি মুহূর্তে তার চেয়ে লক্ষ গুণ বেশি তড়িৎপ্রবাহ চালনা করছে না? তবে প্রকৃতির পদতলে নত হয়ে তারই উপাসনা কর না কেন?'

৪০ শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, আধ্যাত্মিকতা ও বিজ্ঞান, ধ্যান ও কর্মের এই মহান সমন্বয়ের অন্তত কিছুটা আভাস শিক্ষাজগতের প্রত্যেকটি ছাত্রের পাওয়া উচিত, এই পরাবিদ্যা বা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা যাকে আমরা অধ্যাত্মবিজ্ঞান নামে অভিহিত করেছি, এই বিদ্যা মানুষের মধ্যে নৈতিক, নান্দনিক ও আধ্যাত্মিক একটি মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে। ভৌতবিজ্ঞানের চর্চা ও প্রয়োগের সঙ্গে যে নীতিবোধ মিশে রয়েছে তারও জাগরণ ঘটে এই অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চর্চার মধ্য দিয়ে, এই মূল্যবোধগুলির সমন্বয়, বিজ্ঞান ও ধর্মের এই সমন্বয় বেদান্ত ঘোষণা করেছে, আধুনিক যুগে এই সমন্বয়ের অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে পরাবিদ্যার মূর্ত প্রকাশ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অপরাবিদ্যার প্রতিনিধি নরেন্দ্রনাথের (যিনি পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত) আধ্যাত্মিক সম্মিলনে। ক্রমবিকাশের ইতিহাসে মানুষ যখন পরিবেশের ওপর কিছুটা আধিপত্য অর্জন করতে পেরেছে তখনই এই মূল্যবোধগুলি উঠে এসেছে মানুষের সত্তার গভীরতম অনুভূতি থেকে, শুধুমাত্র জৈবিক স্বভাব থেকে নয়। তাই এইরকম একটা ধারণা যদি করা হয় যে, ভৌতবিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের প্রভাবে বা কারিগরি কলাকৌশলের যে নানা প্রয়োগ তার প্রভাবে মানুষের যে জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে তার সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় ভাবেই মানুষের ঐ মূল্যবোধগুলি জেগে উঠবে, সে ধারণা মূর্খতার নামান্তরমাত্র। এই বুদ্ধিহীন ধারণাটি অনেকেই মূর্খের মতো অনুসরণ করেন। স্বর্গীয় বার্ট্রাণ্ড রাসেলের কণ্ঠে এর প্রতিবাদ শুনি ঃ (Impact of Science on Society, p. 77)

'যে যন্ত্রকে ঘিরে আমাদের সভ্যতার বড়াই, সেই যন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে আধুনিক শয়তান আর তারই পূজা হয়ে দাঁড়িয়েছে শয়তান-পূজার আধুনিক সংস্করণ।...

'অনেক কিছুই যান্ত্রিক কলাকৌশলের সাহায্যে গড়ে তোলা যায়, কিন্তু মূল্যবোধ নয়। এই কথাটা আজকের রাজনৈতিক দর্শনের প্রবক্তাদের ভুলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

কাজেই আজকের বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্তিত জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা যদি উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উঠতে পারে, যে পরাবিদ্যা স্বামী বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তাকে উচ্চতম বা শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ের শিক্ষা বলা যেতে পারে। তার কারণ এই বিদ্যা সৃষ্টি করেছে অভূতপূর্ব চারিত্রবল ও অপূর্ব হৃদয়, যা সমুদ্রের মতো গভীর আবার আকাশের মতো উদার। এই বিদ্যাই পরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যকে সমন্বিত করতে বিজ্ঞান ও ধর্মকে সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ করতে এবং ঐহিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে ভেদরেখা লুপ্ত করে দিতে পেরেছে। শিশুর জন্যে চাই এই শিক্ষা। শ্রীরামকৃষ্ণের অভিজ্ঞতা এবং তাঁর জীবনের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে এই বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয় যে মানুষ স্কুলকলেজের শিক্ষাক্রমের যে কোন স্তরেই বা যে কোন অবস্থাতেই এই আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে কৃতার্থ করতে পারে। যে প্রজ্ঞার আলোক তার মধ্যে দীপ্ত হয়ে উঠবে সেই প্রজ্ঞা তাকে উদ্দীপিত করবে জ্ঞানার্জনের প্রত্যেকটি স্তরে, তা প্রাথমিকই হোক কি মাধ্যমিক স্তরেই হোক, স্নাতকস্তরেই হোক, কি স্নাতকোত্তর স্তরেই হোক। এই সঙ্গে এই সত্যটিও আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় যে, এই প্রজ্ঞাদৃষ্টিকে বিযুক্ত করে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার ওপর যদি নির্ভর করে বসে থাকি, তবে হয়তো একদিন এই জ্ঞানার্জন আশীর্বাদ না হয়ে, হয়ে উঠবে অভিশাপ, একদিকে নিয়ে আসবে অহঙ্কার, স্বার্থপরতা, শোষণ ও হিংসা ; অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতা, একাকীত্ব এবং মানসিক ব্যাধি। এই ঘটনা বারবার ঘটেছে, সমাজকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেছে, এমনকি মানবসভ্যতাকেও অতীতে এক একসময় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। আর আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা ইতোমধ্যেই

সেই অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। আমাদের নিজেদের মাতৃভূমিও আধুনিক সভ্যতার এই দানবীয় শক্তিগুলি গ্রহণ করতে শুরু করেছে দ্রুতবেগে। তার বিকৃত প্রভাবও আজকের ভারতীয় সমাজে পরিলক্ষিত। আমরা যদি আমাদের অধ্যাত্মবিদ্যার শাশ্বত বাণীকে আমাদের জীবন দিয়ে গ্রহণ করি, তবেই আমরা আমাদের প্রজ্ঞার সাহায্যে এই বিকৃত প্রভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে সমর্থ হব। আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি তখন আমাদের যে ক্ষমতা এনে দেবে তাই দিয়ে এই যন্ত্রসভ্যতার সমস্ত প্রবাহকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হব, এমনকি নব-আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক শক্তিগুলিকেও সঠিকভাবে ব্যবহার করতে সমর্থ হব।

৪১ বস্তুতন্ত্র-জ্ঞান বনাম পুরুষতন্ত্র-জ্ঞান

আজকের দিনের সবচেয়ে বড় দাবি হলো, আমরা যেন জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হবার সময় সঠিক জীবনদর্শন নিয়ে এগোই। সেই জীবনদর্শন তখনই আমাদের কাছে নির্ভরযোগ্য যখন সেই দর্শন ভৌতবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে সুন্দরভাবে সমন্বিত করতে পারে। বেদান্তের এইখানেই বৈশিষ্ট্য। বিশ্বের নানা দার্শনিক মতবাদের মধ্যে বেদান্তই একমাত্র বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে সন্ত্রস্ত তো নয়ই, বরং তাকে চিরকাল স্বাগত জানিয়েছে। সত্যই একমাত্র পাথেয়—সত্যমেব জয়তে—কোন আত্মসন্তুষ্টির বা মনগড়া কাল্পনিক মতবাদের স্থান নেই এখানে। আধুনিক ভৌতবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গির মতো বেদান্ত চিরকাল সত্যানুসন্ধানী বিচারধারাটিকে ঠিক রেখেছে। ঐ বিচারবিশ্লেষণ এগিয়েছে নিরপেক্ষ ও নিরাসক্ত দৃষ্টি এবং সূক্ষ্মবুদ্ধি ও প্রমাণনির্ভর বিশ্বাসের রাস্তা ধরে। ঠিক এইভাবে না এগোলে জ্ঞানবিজ্ঞানের কোন শাখাতেই একটা নৈতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশ চোখে পড়ে না, বরং যা পড়ে থাকে তা হলো ব্যক্তিনির্ভর কিছু কাল্পনিক বিশ্বাস ও আত্মতুষ্টি।

বেদান্তের এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মেজাজটি অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে শঙ্করাচার্য উল্লেখ করেছেন তাঁর 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' বিষয়টি ব্যাখ্যা করার সময়। তিনি ঐ ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর 'ব্রহ্মসূত্র'-এর ভাষ্য রচনায় ও তাঁর গীতার ওপর মূল্যবান টীকা প্রণয়নে। প্রথমটির ক্ষেত্রে তিনি বস্তুতন্ত্র জ্ঞান ও পুরুষতন্ত্র জ্ঞানের পার্থক্য দেখিয়েছেন, যেটা আমাদের এই অনুচ্ছেদের বিচার্য বিষয়। বস্তুতন্ত্র-জ্ঞান বলতে তিনি এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বস্তুনিচয় থেকে লব্ধ জ্ঞানের কথা বলেছেন—অপরদিকে পুরুষতন্ত্র-জ্ঞান কর্মের কর্তার নিজস্ব ইচ্ছা ও মতামতের নিরিখে নির্মিত। বস্তুতন্ত্র-জ্ঞান বস্তুর বা ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কর্তার দ্বারা নয়, অন্যদিকে পুরুষতন্ত্র-জ্ঞান কর্তার ওপর নির্ভরশীল। 'কর্তুম্, অকর্তুম্, অন্যথা-কর্তুং শক্যতে, পুরুষতন্ত্রবৎ ইব'—করা বা না করা, পরিবর্তিত ভাবে করা বা ধ্বংস করা সবই পুরুষের নিজের ইচ্ছার অধীন, এইভাবে শঙ্করাচার্য দেখেছেন।

এই পুরুষতন্ত্র জ্ঞানকে আশ্রয় করে বিশাল চিন্তাজগত উন্মুক্ত হয়েছে মানুষের সামনে এবং মনুষ্যজীবনে এই জ্ঞানের এক বিশিষ্ট ভূমিকাও অনস্বীকার্য। কিন্তু 'ঈশ্বর' ও 'আত্মা', এই দুটি বিষয় বেদান্তের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র পুরুষের নিজস্ব ইচ্ছা বা অনুমানের বিষয় নয়, বরং বস্তুতন্ত্র অনুসন্ধান ও জ্ঞানের বিষয়। ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ব্রহ্মকে সর্বভূতান্তরাত্মা ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। এটা আমরা ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে, ব্রহ্ম সকলের অন্তরে 'প্রত্যগাত্মা' রূপে বিরাজিত, এই সত্য ব্রহ্ম আমাদের নীতিবোধ ও সামাজিক নীতিশাস্ত্রের একমাত্র যুক্তিসহ অনুমোদনের ভিত্তি। এই আত্মা শাশ্বত সত্য কারণ প্রত্যেকটি জ্ঞান ও কর্মের পেছনে এই আত্মা কর্তারূপে ক্রিয়াশীল, ক্রিয়ার উদ্দেশ্যরূপে নয়। তাই একে অস্বীকার করাও অসম্ভব, কারণ অস্বীকার করার কাজটিও সম্পন্ন করতে কর্তা লাগে,—'য এব

নিরাকর্তা তস্যৈব আত্মত্বাৎ।' এই ব্রহ্ম বলতে চলিত একেশ্বরবাদের অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় কোন ঈশ্বরের ধারণা নয়। এই ধারণা তৈরি হয়েছে একধরনের বিশ্বাস থেকে যেখানে যুক্তিবিচারের কোন স্থান নেই। এই ঈশ্বরকে মানুষ সৃষ্টি করেছে তার নিজের মনগড়া এক যুক্তি দিয়ে ; কখনো সিংহাসনে বসিয়ে পূজা করেছে, কখনো অবহেলা করে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু উপনিষদ্ যে সর্বভূতান্তরাত্মা ব্রহ্মের ধারণা আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে তা একটি অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য—*'অনুভবাবসানত্বাৎ ভূত-বস্তু-বিষয়ত্বাৎ চ ব্রহ্মজ্ঞানস্য'*—ব্রহ্মজ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য, অতএব যা আছে এমন কোন বস্তু বা ঘটনার দ্যোতক। যখন আমরা আধ্যাত্মিক ভাবে অজ্ঞ, তখন এই জ্ঞান আমাদের অজানা—কিন্তু তার মানে এই নয় যে এটি জানা অসম্ভব, কারণ এটি জ্ঞাতার আত্মসত্তা। কাজেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের চেয়ে আরও গভীরভাবে জানার বিষয় এই আত্মসত্তা। কিন্তু আমাদের জীবনের চলার পথে আত্মবস্তু ও অনাত্মবস্তুর এক মিশ্রণ আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে, তাই সত্যকে জানার জন্যে প্রয়োজন হয় নিত্যানিত্য বস্তুবিচার ও তীব্র অনুসন্ধিৎসা।

সদাপরিবর্তনশীল এই শরীর, স্নায়ুতন্ত্র, মন, বুদ্ধি ও মহত্তত্ত্বের পাঁচটি আবরণ বা পঞ্চকোশের অভ্যন্তরে এই অনন্ত, শাশ্বত আত্মবস্তুর উপলব্ধির পথে উপনিষদের ঋষিগণ এগিয়েছিলেন তীব্র অনুসন্ধিৎসা ও সাধনাকে সম্বল করে। কঠোপনিষদে শিষ্য নচিকেতাকে যমরাজ এই ইঙ্গিত দিচ্ছেন, যখন বলছেন (১/৩/১২) ঃ

'এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়ো আত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ॥'

—এই আত্মা সর্বভূতে আবৃত অবস্থায় থাকায় সকলের কাছে প্রকাশিত হন না। কিন্তু একাগ্র ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিসহায়ে মেধাবিগণ তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

ঠিক এই একই সত্যের প্রতিধ্বনি আমরা পাই বিংশ শতাব্দীর জীববিদ্যায়, বিশেষত এই পঞ্চকোষের প্রথম তিনটি কোষের ব্যাখ্যায়। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ যে 'পূর্বের দ্বারা পরের ঘটনার আপূরণ' (তৈনৈষ পূর্ণঃ) বিষয়টি উপস্থাপিত করেছিল সেই Infilling বা আপূরণতত্ত্বটি আধুনিক জীববিজ্ঞানী জর্জ গেলর্ড সিম্পসনের গবেষণাতে প্রমাণিত ঃ (The Meaning of Evolution, p. 312)

'আধুনিক বিজ্ঞানকে তিনটি স্তরে যে মোটামুটি ভাগ করা হয়েছে যেমন পদার্থবিদ্যার স্তর, জীববিদ্যার স্তর ও সমাজবিজ্ঞানের স্তর, এই স্তরভেদগুলি সমগ্র পদার্থ ও শক্তির এই বিশাল ক্ষেত্রকে যেন তিনটি পৃথক ও বিশিষ্ট এক একটি সংগঠনের রূপ দিয়েছে। তিনটির প্রত্যেকটিই ক্রমশ জটিলতর ও বৃহত্তর রূপ নিচ্ছে এবং অন্যগুলিকেও আত্তীকরণ করে নিচ্ছে। জৈবিক স্তরের সংগঠন পদার্থের স্তরের সংগঠন থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে এবং তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নিচ্ছে, দূরে সরিয়ে দিচ্ছে না। সমাজসংগঠন এখন পদার্থ স্তরের সংগঠন ও জৈবিক স্তরের সংগঠনগুলিকেও নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নিচ্ছে ও সেইসঙ্গে অধিকতর জটিলতার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।'

মানুষের শাশ্বত ও মৃত্যুঞ্জয় যে দৈবী সত্তা তার উপলব্ধি ব্যাহত হচ্ছে মনের নানা অশুদ্ধ সংস্কারের হাতে। এই অশুদ্ধ সংস্কারগুলির উৎস মানুষের অহঙ্কার, কামনা-বাসনা ও অনুরাগ-বিরাগ যা জড়িয়ে রয়েছে তার জৈবিক অস্তিত্বের সঙ্গে। সত্যের অনুসন্ধান, তা বহির্জগতেই হোক কি অন্তর্জগতেই হোক, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানরাশি আনয়ন করুক বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, উভয়ক্ষেত্রেই এই অশুদ্ধ সংস্কারগুলির অপনোদন আবশ্যক। তবেই বহির্জগতে বা অন্তর্জগতে, উভয়ক্ষেত্রে বহিরঙ্গ আবরণের অভ্যন্তরে সত্যের অনুসন্ধান করবার মানসিক ক্ষমতা জন্মায়। একেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বলে। 'গীতা'য় অর্জুনকে লক্ষ্য করে শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলতে

চেয়েছেন, যা শঙ্করাচার্য পরে বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন ঃ (৭/২৭-২৮)

'ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥'

—হে পরন্তপ ভারত! ইচ্ছা ও দ্বেষ থেকে সমদ্ভূত শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বজনিত মোহের দ্বারা সমস্ত জীব মোহ প্রাপ্ত হয়।

'যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥'

—কিন্তু যে সব পুণ্যকর্মা ব্যক্তির অশুদ্ধিরূপ প্রতিবন্ধক বিনষ্ট হয়েছে, তাঁরা সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বমোহ থেকে নির্মুক্ত ও দৃঢ়ব্রত হয়ে আমাকে ভজনা করে।

প্রথম শ্লোকটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শঙ্করাচার্য বলছেন, 'এটি সর্ববাদিসম্মত সত্য যে, এমনকি বহির্জগতেও বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সেইসকল ব্যক্তির কাছে প্রতিভাত হয় না, যাঁদের মন বাসনার দ্বারা বিক্ষিপ্ত। কাজেই এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে যে, অন্তরাত্মার উপলব্ধি যা বহু বাধা অতিক্রম করে লাভ করবার বিষয় তা বাসনায় বদ্ধ মানুষজনের জন্য নয়। তারা ক্রমাগতই বিভ্রান্ত হয়। কাজেই যাদের বুদ্ধি দ্বন্দ্বমোহের দ্বারা বিভ্রান্ত, তারা আমাকে (সর্বভূতান্তরাত্মা যে আমি) জানে না ও আমাকে নিজ অন্তরাত্মারূপে পূজাও করে না।'

৪২ বিজ্ঞান ও ধর্ম বনাম অলৌকিকতা ও যাদুবিদ্যা

ধর্মের নামে ও যোগের নামে আমাদের দেশের বেশ কিছু মানুষ, বিশেষত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি অংশ, এমনকি আমাদের প্রশাসনের বেশ কিছু মানুষ, ছুটে চলেছে, নানা রকমের অর্থহীন ও নিষ্ফলা সব অলৌকিক কাণ্ডকারখানা ও যাদুবিদ্যার পেছনে। বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য

ক্রিয়াকলাপের যুগে এই সব অলৌকিক কাণ্ডগুলি নিতান্ত ছেলেমানুষী মাত্র। এই অলৌকিকতা চলছে সস্তাদরে ধর্মের নামে ও যোগের নামে, এবং এর কলাকৌশলীরা তা চালাচ্ছে গোপনে। অথচ ঐ একই ধরনের যাদুবিদ্যা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করে দেখিয়ে দেয় বিজ্ঞান, যা সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য, সকলের কাছে প্রমাণসাপেক্ষ এবং উন্মুক্ত, যার সঙ্গে গোপনীয়তার কোন সম্পর্ক নেই। এই যাদুবিদ্যা তো আমরা অহরহ দেখছি চিকিৎসাজগতে কি খাদ্য-উৎপাদনে অথবা বাহন-সহ মানুষকে চাঁদে বা মঙ্গলগ্রহে পাঠিয়ে এবং ফেরত আনিয়ে।

বুদ্ধের মতো মহান ধর্মপ্রবক্তা সবসময় ধর্মের নামে এই ধরনের গোপনীয়তা ও অলৌকিকতাকে নিরুৎসাহিত করতেন। যা গোপন তা সাধারণত পবিত্র নয়। তাঁর শিক্ষা ছিল গভীর কিন্তু মুক্ত। তিনি বলতেন, 'এহি পস্‌স', 'এহি পস্‌স' (এস ও দেখ, এস ও দেখ)। তাঁর প্রধান শিষ্য আনন্দকে তিনি বলছেন, 'তথাগতের কাছে গোপনীয়তা বলে কিছু নেই। আনন্দ, গোপনীয়তা আছে তিনটি বিষয়ে—পুরোহিততন্ত্রে, ভ্রান্ত জ্ঞানে ও দেহব্যবসায়ে।'

তাই এই বিষয়টি সত্যিই প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের দেশবাসী ধর্মের নামে এই যে সস্তার যাদুবিদ্যা চলেছে, তার থেকে ঘুরে দাঁড়াক কারণ এই অলৌকিকতার পেছনে ছুটে ছুটে আমরা দুর্বল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি আর এই দুর্বলতা থেকে এসেছে শতাব্দব্যাপী রাজনৈতিক দাসত্ব। আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণের কথা ভেবে বিজ্ঞানের মুক্ত যাদুবিদ্যার দিকে বরং আমাদের দৃষ্টিপাত হোক।

আধুনিক ভৌতবিজ্ঞান আমাদের সামনে যে সব অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারে, তাকে একমাত্র পাল্লা দিতে পারে বা অনেকসময় অতিক্রম করে যেতে পারে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের দ্বারা প্রসূত মানবচরিত্রের অলৌকিক

ক্ষমতা। অধ্যাত্মবিজ্ঞান আমাদের সমাজকে উপহার দেয় পবিত্রতা, প্রেম, মৈত্রী আবার ত্যাগ, সেবা ও কর্মকুশলতা। তাই লক্ষ্য করি, মহাত্মা গান্ধী অলৌকিকভাবে ঘৃণাকে পরিণত করতে পারতেন প্রেমে, হিংসাকে অহিংসায়।

ধর্মের নামে ঐ যে সস্তার অলৌকিকতা চলে বা যোগশক্তির নামে চলে ভণ্ডামি, এর ওপর নির্ভরতা মানুষের মনকে দুর্বল করে দেয়, মানুষ অনেকটা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই বেদান্ত ও সেই সঙ্গে পৃথিবীর আধ্যাত্মিক মহাপুরুষগণও সবসময় এই দুর্বলতা পরিহার করতে বলেছেন। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে মোহগ্রস্ত মানুষের মোহভঙ্গ করবেন বলেই স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত প্রচার করেছেন।

তিনি ঘোষণা করলেন, 'শক্তি, শক্তির শিক্ষা পাই আমি উপনিষদের প্রতিটি পৃষ্ঠা থেকে।' তিনি চাইতেন বরং মানুষ নাস্তিক হোক বা অজ্ঞেয়বাদী হোক কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন নির্বোধ যেন না হয়,—কারণ নাস্তিকেরা বা অজ্ঞেয়বাদীরা তবু মুক্তির স্বাদ পেতে পারে, কিন্তু কুসংস্কারাচ্ছন্ন দুর্বলেরা কখনই নয়। তাই 'গীতা'য় শ্রীকৃষ্ণ 'বুদ্ধিযোগ' কথাটি উল্লেখ করেছেন, কারণ এই বুদ্ধি ও যুক্তির সাহায্যেই আমরা জীবনে এগোতে পারব।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে বেদান্ত একটা যুক্তিসঙ্গত ও সর্বজনগ্রাহ্য ভিত্তি দিতে পেরেছে, যা পৃথিবীর যে কোন ধর্মমতকে সাহায্য করে তার নিজ ধর্মমতের সারসত্যটি বুঝে নিতে, পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে ও ভৌতবিজ্ঞানের বিচারধারাকে প্রকৃত মর্যাদা দিতে। ঠিক এই ধরনের কাজ আধুনিক বিজ্ঞানও করে চলেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অনুসন্ধান ও জ্ঞানার্জনের কাজ চলছে সেগুলির সমন্বয়সাধনে ও প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের গবেষণাকে সত্যানুসন্ধানে সাহায্য করে। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সময়ে এই বিজ্ঞান ও ধর্ম মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে জীবনের পরিপূর্ণতার পথে।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এই বহিঃপ্রকৃতিকে অপরাপ্রকৃতির একটি রূপ ও অন্তঃপ্রকৃতিকে পরাপ্রকৃতির একটি রূপ বলে উল্লেখ করেছেন। এই পরাপ্রকৃতিকে জীবের উচ্চতর প্রকৃতি বা দৈবী সত্তা বলে নিরূপণ করা হয়েছে : (৭/৫)

'অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥'

—এই (আমার) সাধারণী স্বভাব, কিন্তু এই স্বভাব ছাড়া আমার একটি উচ্চতর স্বভাব আছে। হে মহাবাহো অর্জুন, ঐ দ্বিতীয় স্বভাব (আমার) চেতনস্বরূপ, যার দ্বারা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সঞ্জীবিত।

এই উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ও ষষ্ঠ শ্লোকটি প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য বলছেন :

'প্রকৃতি-দ্বয়-দ্বারেণ অহম্
সর্বজ্ঞ ঈশ্বরো জগতঃ কারণম্—'

—এই দুইপ্রকার প্রকৃতি বা স্বভাবের মধ্য দিয়ে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর (আমি) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণরূপে বর্তমান।

অন্তঃপ্রকৃতির বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে নিবিষ্ট যে আধ্যাত্মিকতা ও বহিঃপ্রকৃতির অনুসন্ধানে আবিষ্ট যে আধুনিক বিজ্ঞান, এই উভয়ের সমন্বয়ে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠতে পারে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি আমরা পাই জ্যোতির্বিজ্ঞানী আর. এ. মিল্‌কম্যান-এর আত্মজীবনীর শেষ দিকে :

'আমার মনে হয় সমস্ত মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও অগ্রগতি দুটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, প্রথমত ধর্মচেতনা, দ্বিতীয়ত বিজ্ঞানচেতনা বা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা। একটি ছাড়া অপরটি ব্যাপকভাবে ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে না। দ্বিতীয়টির জন্য রয়েছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ও অসংখ্য গবেষণাগার। কিন্তু প্রথমটির জন্য রয়েছে একটা সর্বজনীন সুযোগ, যেখানে কাউকে বাদ দেওয়া হয় নি।'

৪৩ যুক্তিনির্ভরতা ও যুক্তিবাদে অগ্রগতি

ইতোমধ্যে আমি ভৌতবিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও সেইসঙ্গে আচারগত ধর্মের সীমাবদ্ধতা, দুটিই আলোচনা করেছি ও স্বামী বিবেকানন্দের সেই উদ্ধৃতি স্মরণ করেছি যেখানে তিনি সমগ্র ধর্মশাস্ত্রকে যুক্তিবিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করতে বলেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে যে যুক্তিবাদের অগ্রগতি ঘটেছিল তার ফলে সমগ্র বিশ্বে ধর্মকে শুধু বিজ্ঞানই আক্রমণ করেছে তা নয়, যুক্তিবাদী দার্শনিক অভিমতগুলিও ধর্মকে ধরাশায়ী করতে দ্বিধা করে নি। এই যুক্তিবাদের সাহায্যে স্বচ্ছ চিন্তার এক বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখেছি, যা মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক সমাদরের বিষয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের পরে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসে দেখছি যে, যুক্তিবাদ সেই গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণাগুলির নামে যতই শপথ করুক, সে আর যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। বিংশ শতাব্দীর যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি তা কিন্তু এখনো যুক্তিবাদের চিরাচরিত ধারণাগুলির ওপর আঘাত হানতে পারছে না। বিজ্ঞান তখনই যুক্তিবাদকে আধুনিক করে তুলতে পারবে যখন যুক্তিবাদ ধর্মের থেকে যুক্তিহীন গোঁড়ামিকে আলাদা করতে পারবে। আর তা না করে ধর্মকে নস্যাৎ করতে গিয়ে যুক্তিবাদী চিন্তা ইদানীংকালে যুক্তিহীন প্রয়াস হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যুক্তিবাদ কতদূর পর্যন্ত এগোতে পারে, কোথায় গিয়ে তর্কাতীত উপলব্ধিলাভের পথ দেখিয়ে দেয়, এই ধারণাই একমাত্র আধুনিক যুক্তিবাদী চিন্তাকে যুক্তিহীনতা থেকে রক্ষা করতে পারে ও যুক্তিবাদকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে জীবনের বিচিত্র পথে তথা সত্য অনুসন্ধানের পথে। তখন মানবসমাজের কুসংস্কার ও যুক্তিহীন আচারবিচারের বিরুদ্ধে এই প্রয়োজনীয় সংগ্রামে যুক্তিবাদ ধর্মকে পাশেই পাবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যে যুক্তিবাদী চিন্তা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মূল নিয়ামকশক্তি তাকে এই বিশ্বরহস্য অনুসন্ধানের ব্যাপক কর্মযজ্ঞে সীমাবদ্ধ

আখ্যাটি দেব কেন? ঋষি বাদরায়ণের ব্রহ্ম-সূত্রেও যুক্তিবাদী চিন্তাকে—'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' অর্থাৎ চূড়ান্ত নয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কেন? মানবসভ্যতার বিস্তার ঘটেছে যুক্তিবাদী চিন্তার পথ ধরে। কিন্তু সত্যের পথে মানুষের যে অদম্য অভিযাত্রা, এগিয়ে যাবার যে অবিরাম প্রচেষ্টা এর ফলেই মানুষ বুঝতে পেরেছে যুক্তিবাদী চিন্তা কতদূর নিয়ে যেতে পারবে, কোথায় পারবে না। এই যে 'সীমাবদ্ধতা' এর অর্থ এই নয় যে মানুষ যুক্তিহীন বিশ্বাসে ফিরে যাবে, বরং যুক্তিবাদ মানুষের চিন্তাকে উচ্চতর সত্য অনুসন্ধানের উপযোগী করে তুলবে। বেদান্তমতে এই হলো বুদ্ধির লক্ষ্য, যা আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। অনুপম ভাষায় বিষয়টি ব্যক্ত করেছেন স্বামীজী, যেটা আমরা উদ্ধৃত না করে পারছি না : (বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৯)

'যুক্তির ওপরই আমাদের ভিত্তিস্থাপন করতে হবে, যুক্তি আমাদের যতদূর নিয়ে যায় ততদূর যেতে হবে ; যুক্তি যখন আর চলবে না, তখন যুক্তিই সর্বোচ্চ অবস্থা লাভের পথ দেখিয়ে দেবে।'

বেদান্তের ব্যাখ্যা অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচার তখনই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে যখন এই বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের তথ্যাদি নিয়ে, কর্তা বা বিশ্লেষকটিকে পুরো বাদ দিয়ে। মানুষের চারদিকে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের তথ্যসম্ভার থেকে সত্য অনুসন্ধানের কাজে মানুষের সবচেয়ে বড় সহায় তার বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচার। ক্রমশ মানুষ তার এই কৌশলটিকে বিকশিত করে তুলেছে। সেইসঙ্গে বিকশিত হয়ে উঠেছে তার ভাষা যার সাহায্যে বহির্জগতের এই আপাতবিক্ষিপ্ত ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্যসম্ভারকে সে মানবকল্যাণে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছে। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচারের এই অগ্রগতি যেখানে এত ব্যাপক ও বিশাল, সেখানে তার সীমাবদ্ধতার কথা কি কখনও শেষ কথা হতে পারে? আমরা কি লক্ষ্য করি নি এক যুগের যুক্তিবিচারকে অতিক্রম করে এগিয়ে গেছে পরবর্তী

যুগের যুক্তিবিচার? সেই প্রাচীন গুহামানবের অন্ধবিশ্বাস থেকে আজকের বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ—কি অসীম অগ্রগতিই না ঘটেছে যুক্তিবিচারের পথে। কাজেই আমরা তো এই সিদ্ধান্ত করতেই পারি যে আজ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচারের যে সীমাবদ্ধতা আমরা লক্ষ্য করছি আগামী প্রজন্ম সেই সীমাবদ্ধতাকে সহজেই অতিক্রম করবে।

এই সংশয় ও জিজ্ঞাসার অত্যন্ত স্পষ্ট ও সাহসিক জবাব আমরা পাই বেদান্তের মধ্যে। এই উত্তরের পেছনে রয়েছে মানুষের এক তীব্র সংগ্রামের ইতিহাস। আমি ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি, এই সংগ্রাম ছিল কখনো সত্যানুসন্ধানের অদম্য প্রয়াসে, কখনো মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের খোঁজে। এর ফলে যুক্তিবিচার, ভাষা সবই বিকাশ লাভ করেছে। বেদান্ত এই যুক্তিবিচারের ক্ষমতাকে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে মনে করে ও এই শক্তিকে শুদ্ধভাবে রক্ষা করা ও এর ঔজ্জ্বল্যকে এমনভাবে রক্ষা করার কথা বলে, যাতে কোনভাবে কোন ক্ষণিক দুর্বলতা একে আচ্ছন্ন করতে না পারে।

উপলব্ধি বা অনুভূতি রাজ্যের সঙ্গে যুক্তিবাদের সংঘাতের ইতিহাসের মধ্যে তার গতিপথের সঠিক ইঙ্গিতটি পাওয়া যায়। পুঁথিগত তর্কশাস্ত্রের যুক্তিবাদের দৃঢ় পরিকাঠামোয় মানুষের উপলব্ধি জগতের কোন সম্পর্কই নেই এবং তা কোন নতুন উপাত্ত সৃষ্টি করতে পারে না। একমাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বিচার বিশ্লেষণের প্রেক্ষাপটেই যুক্তিবাদের সঙ্গে নবতর উপলব্ধির সংঘাত লক্ষ্য করা যায়। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বরহস্য উন্মোচনের পথে যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি তা কিন্তু সম্ভব হয়েছে এই সংঘাতের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক বিচারকে উন্নত করে তোলার মধ্য দিয়ে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এসে বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন যে বৈজ্ঞানিক যুক্তির যে পরিকাঠামো নিয়ে এতদিন গবেষণা এগিয়েছে, যেমন ধরা যাক পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে, সেই পরিকাঠামো দৃষ্টিকে ব্যাপকতা

দিতে পারছে না, বিশ্লেষণকে একদেশদর্শী করে ফেলছে। প্রখ্যাত পদার্থবিদ হাইসেন্‌বার্গের বক্তব্যের মধ্যে এই সুর লক্ষণীয় ঃ (Physics & Philosophy, p. 169)

'উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানচিন্তার যে পরিকাঠামো বিকশিত হয়ে উঠেছিল তা অনেকটা একদেশদর্শী, কতকগুলি অপরিবর্তনীয় তত্ত্বের দ্বারা তা যেন নিয়ন্ত্রিত। ফলে বিজ্ঞানচর্চা শুধু নয়, জনমানসেও এই ঝোঁকটি লক্ষণীয়। এর পেছনে ছিল পদার্থবিদ্যায় আবিষ্কৃত সনাতন তত্ত্বগুলি, যেগুলি পদার্থ, সময়, মহাকাশ ইত্যাদির কার্যকারণ নিয়ে বেশ কিছু দৃঢ়বদ্ধ ধারণা সৃষ্টি করেছে। আমরা এই ধারণা নিয়েই বস্তুকে পর্যবেক্ষণ করতে শিখেছি। বস্তুই এখানে অনুসন্ধানের বিষয়, মূলগত সত্য। এই বস্তুজগতের নিয়ন্ত্রণই হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিজ্ঞানের অগ্রগতি। প্রয়োজনীয়তাই এখানে লক্ষ্য। ...এই পরিকাঠামো এত সংকীর্ণ, এতটাই অপরিবর্তনীয় আকৃতির যে বস্তুর অন্য কোন সত্তা, অন্য কোন রূপ এখানে স্থান পায় নি। এই অন্য রূপ, অন্য সত্তা আমাদের ভাষাসাহিত্যে হয়তো ব্যবহারও করে এসেছি, কিন্তু তা গবেষণায় স্থান পায় নি, যেমন চৈতন্যসত্তা, মন বা প্রাণের স্বরূপ. ইত্যাদি।'

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে যখন পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন নিয়ে যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলি ঘটতে লাগল, তখন ঐ আপাত-অপরিবর্তনীয় পরিকাঠামো আর টিকে থাকতে পারল না। কোয়াণ্টাম-তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতাবাদের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে এই পরিকাঠামো একেবারেই ভেঙে পড়ল। বৈজ্ঞানিক গবেষণার জগতে সবচেয়ে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এল সত্য অনুসন্ধানে ; শুধু অনুসন্ধানের বিষয় নয়, দ্রষ্টা বা কর্তাকেও বিবেচনা করার মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে কোয়াণ্টাম-তত্ত্বের বিশেষত্ব উল্লেখ করে হাইসেন্‌বার্গ লিখলেন ঃ (তদেব, পৃঃ ৩৩)

'সত্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের পথে সবচেয়ে বড় মৌলিক পরিবর্তন দেখা গেল কোয়াণ্টাম-তত্ত্বের আবিষ্কারে এবং এই তত্ত্বেই পারমাণবিক গবেষণার ক্ষেত্রে এক নতুন ধ্যানধারণা বিকাশ লাভ করল।...সত্যকে চেনার যে পথ কোয়াণ্টাম-তত্ত্বে বিকশিত হয়েছে তা অতীতের ধারাবাহিকতা থেকে কিন্তু বিচ্ছিন্ন। আধুনিক বিজ্ঞানচিন্তায় এ এক নতুন পদক্ষেপ।'

আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই কেমন করে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচার গতানুগতিক যুক্তিবাদী-চিন্তা ও আপাত অপরিবর্তনীয় ধ্যানধারণা থেকে ক্রমশ এক বৈপ্লবিক উচ্চতায় উঠে চলেছে যেখানে কোয়াণ্টাম-তত্ত্বের কথা ও আপেক্ষিকতাবাদের কথা মানবসভ্যতা জানতে পারছে। যুক্তিবাদী-চিন্তার প্রত্যেকটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপ, প্রত্যেকটি ফলপ্রসূ চিন্তার স্বচ্ছতা সম্ভব হয়েছে নিরাসক্তি ও সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রসার ও ঘটনা পরিসরের ব্যাপ্তির ফলে। আমরা আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে যাকে যুক্তিবাদ বলি, সেই যুক্তিবাদী চিন্তা তার সীমা অতিক্রম করেছে, রূপ নিয়েছে পদার্থবিদ্যার আবিষ্কৃত তত্ত্বগুলির মধ্যে। এসেছে তথ্যাদি থেকে প্রকল্প-গঠন ও সেই প্রকল্পকে যাচাই করে নেওয়ার শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ। আবার ঠিক একইভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সনাতন ধ্যানধারণা থেকে উঠে এসেছে তার সীমা অতিক্রম করে বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যা।

যুক্তিবাদ এখন প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা, প্রত্যেকটি অনুভূতির মূল্যায়ন করছে ও তা করতে গিয়ে নিজের সমালোচনা করতেও ছাড়ছে না। এর ফলে সমগ্র পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য দর্শনের গবেষণায় এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। স্বভাবত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যাদির ঊর্ধ্বে চিন্তাকে বর্ধিত করতে গেলে সেটা গতানুগতিক যুক্তিবাদী চিন্তা বা গতানুগতিক বৈজ্ঞানিক বিচার দিয়ে আর পরিমাপ করা যাচ্ছে না। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক তাই দেখলেন, যুক্তিবাদী চিন্তাবলে আমরা যা বলি তা আমাদেরই অবচেতন মন ও অবিবেক মনের নিয়ন্ত্রণাধীন এক অস্থির

তরঙ্গমাত্র। এই তরঙ্গের সীমাবদ্ধতা মানুষের এক মানবিক দৃষ্টিকোণে, যেমন বলতে চেয়েছেন স্যার জেমস জীনস। এই একই ধারণা বেদান্ত ব্যক্ত করেছে। বেদান্ত বলছে, চিন্তা তখনই সীমাবদ্ধ যখন সে মানুষের চেতন অবস্থা বা জাগ্রত অবস্থার মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। এই জাগ্রত অবস্থায় আছে মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যাদি, তা কাজের ও চিন্তার কর্তা ও করণ, তার অহং। এই সবগুলি নিয়েই সে তার একটি জগৎ গড়ে তুলেছে যেখানে একটির সঙ্গে অপরটির সংযোগ ও বিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠছে তার সত্যের ধারণা। বিংশ শতাব্দীর জীববিদ্যা, ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ব, অন্যদিকে কোয়াণ্টাম-তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতাবাদ সমগ্র বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচারকে জাগ্রত অবস্থা থেকে আরও সূক্ষ্মস্তরে নিয়ে গেছে। এই যুক্তিবিচার এখন আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সীমারেখায় থেমে নেই, (বেদান্তের ভাষায় জাগ্রত অবস্থায় নয়)। বেদান্ত জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থাকে চিহ্নিত করেছিল। আধুনিক যুক্তিবিচার মানুষের ও প্রকৃতির অজানা রহস্যের গভীরে ডুব দিয়েছে সত্যের ঐ অতীন্দ্রিয় রূপকে ধরার আকিঞ্চনে।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যে সত্য যুক্তিবিচারকে পরাস্ত করতে তৎপর সেই সত্য দেশকালের দ্বারা আবদ্ধ কোন স্থির বস্তু নয়, সেই সত্য প্রবহমান দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে যে ঘটনাপ্রবাহ তারই বর্ণনা। এই বিচারধারায় প্রত্যেকটি কর্মের বিষয় ও কর্মের কর্তা প্রবহমান দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে এক একটি আপেক্ষিক অবস্থানমাত্র। এই ধরনের অনুভূতি স্বপ্নের অবস্থাতেই মানুষের হয়। বিজ্ঞান যদি দেখে যে তার পর্যবেক্ষণের বিষয়ের মধ্যে ঐ কর্মের কর্তা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে বসে আছে তখন বস্তুনির্ভর নিরপেক্ষ দৃষ্টিবলে কিছু কি সম্ভব হয়? আধুনিক পরমাণুবিজ্ঞানে ঠিক এই ঘটনাই ঘটেছে। অর্থাৎ দৃষ্টি তখনই সঠিক হবে যখন কর্তাও কর্মের মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট হবে। যখন পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি

এইভাবে একটা ব্যাপকতা লাভ করে, তখন যুক্তিবিচারকে আরও তীক্ষ্ণ, আরও সূক্ষ্ম হয়ে উঠতে হয়। তবেই সত্যের সূক্ষ্ম রূপটি ধরা পড়ে। এইটা একটা নিরাসক্ত মন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি ছাড়া সম্ভব নয়। বেদান্ত একেই বলতে চেয়েছে ইন্দ্রিয়নির্ভরতা থেকে যুক্তিবিচারের মুক্তি।

এই দৃষ্টি লাভ করতে পারলে চেতন জগৎ ও অবচেতন জগৎ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকে না, জাগ্রৎ অবস্থা ও স্বপ্নের অবস্থা তখন এক হয়ে যায়। একেই *'দৃশ্যম্'* বলছি যখন অনুভূতি পর্যবেক্ষণের সঙ্গে মিলিত হয়। এই *'দৃশ্যম্'*-এর পেছনে থাকে যুক্তিবিচার, বেদান্ত যাকে বলেছে 'বুদ্ধি'। এই বুদ্ধি-ই পারে *'দৃশ্যম্'*-এর সঙ্গে *'দৃক্'* বা কর্তাকে যুক্ত করতে ও তার স্বরূপ সন্ধান করতে। সুতরাং আমাদের যা জানা আছে সেই জানা সম্পূর্ণ নয় যদি কে জানে, তার উত্তর দিতে না পারি। 'জাগ্রৎ' অবস্থায় প্রত্যেকটি বস্তুর অস্তিত্বই যে দেশ, কাল ও কার্যকারণের পরিপ্রেক্ষিতে আপেক্ষিক, এই সত্য বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচারের দ্বারা প্রমাণিত। আপেক্ষিকতাবাদের যে তত্ত্ব পদার্থবিদ্যার গবেষণায় উঠে এসেছে, সেই তত্ত্ব বস্তুর বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে বস্তুকে প্রবহমান দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে এক আপেক্ষিক অবস্থানরূপে। স্বপ্নাবস্থাকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাই চিত্তভূমি বা আমাদের মনোময়-কোষ একটি বাস্তব সত্য, অন্য যে কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাখ্যা অসত্যরূপে প্রমাণিত। বেদান্তের দৃষ্টিতে এই অনুসন্ধান বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচারকে 'বুদ্ধি' বা দার্শনিক সূক্ষ্মদৃষ্টির স্তরে নিয়ে যায়। দার্শনিক জিজ্ঞাসা *'দৃশ্যম্'*-এর আপেক্ষিক অবস্থান আবিষ্কার করে, জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় মানুষের যে অহংভাবটি তারও আপেক্ষিক ভূমিকাকে সন্তর্পণে অনুসরণ করে। এই সিদ্ধান্তে কিন্তু জিজ্ঞাসা থেমে থাকে না, অনুসন্ধান চলে অপরিবর্তনীয় কোন সত্যতার যা হয়তো এই দৃশ্যমান জগতের পেছনে শাশ্বতরূপে বর্তমান। 'জাগ্রৎ' ও স্বপ্নাবস্থার যে অহংভাব বা 'আমি' তা বদলায়, কিন্তু

আমাদের জ্ঞানরাশি ও তথ্যাবলীর যে পরম্পরা তার পেছনে এক অপরিবর্তনীয় আত্মস্বরূপের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

দুই অবস্থার যে অহংভাব তার পেছনে এই যে এক শাশ্বত আত্মস্বরূপের কথা বলা হচ্ছে, এ কি সত্যিই অনুভববেদ্য? এই অপরিহার্য প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বৈদান্তিক যুক্তিবিচার মনের একটি তৃতীয় অবস্থার কথা উল্লেখ করেছে। 'জাগ্রৎ' ও স্বপ্নাবস্থা থেকে ভিন্ন একটি অবস্থা যার নাম দেওয়া হয়েছে 'সুষুপ্তি', যখন কর্মের বিষয় ও কর্মের কর্তা শাশ্বত আত্মস্বরূপ বা পরমাত্মা বা ব্রহ্মে অবলুপ্ত হয়। এই অবস্থায় সমগ্র জগৎ, তার ঘটনা এবং ঘটনার বিষয় ও ঘটনার কর্তা সবই চলমান প্রতিচ্ছায়ামাত্র। সুষুপ্তি এই সত্য মানবমনে তখনই প্রকাশিত করে যখন আসক্তির শেষ সূত্রটুকু পর্যন্ত ছিন্ন হয়ে যায়, জাগ্রৎ অবস্থার পেছনে যে কারণসূত্র সেটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। এখানে কোয়াণ্টাম-তত্ত্ব নীরব, সরব বেদান্ত। এই সত্যকে বেদান্ত 'তুরীয়' নামে ঘোষণা করেছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ তার সপ্তম শ্লোকে এই অবস্থাটিকে ব্যাখ্যা করেছে ঃ

'অদৃষ্টমব্যবহার্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং
প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে। স আত্মা। স বিজ্ঞেয়ঃ॥'

—যিনি অদৃশ্য, অব্যবহার্য, অগ্রাহ্য, অননুমেয়, অচিন্ত্য, অনির্দেশ্য, যিনি কেবল 'আত্মা' এই প্রতীতির গম্য, যিনি প্রপঞ্চের বিরামস্বরূপ, শান্ত, শিব ও অদ্বিতীয়, তাঁকেই বিবেকীরা চতুর্থ* বলে থাকেন। তিনিই আত্মা, তিনিই বিজ্ঞেয়।

অতএব সমস্ত অভিজ্ঞতা 'আত্মা'-তে একীভূত বলা যায়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আত্মারই চিৎস্বরূপ। সর্বভূতে আত্মা বিরাজমান তাই চিৎস্বরূপ,

---

*ভ্রান্তিতে দড়িকে যেমন সাপ, লাঠি বা জলধারা কল্পনা করা হয়, তেমনি এই তিন ভ্রম অপনোদিত হলে পরমাত্মা অর্থাৎ পরম সত্য (চতুর্থ) প্রকাশিত হয়।

অদ্বিতীয়, অনন্ত, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। অন্তর্নিহিত এই চেতনা অপরোক্ষ, যে সত্যের প্রতিধ্বনি আমরা পাই পরমাণু-বিজ্ঞানী এরউইং শ্রডিঙ্গারের লেখায় ঃ (What is Life? pp. 90-91)

'চেতনার অনুভূতি একক, কখনও দ্বৈত নয়...এখানে দ্বৈতের স্থান নেই। এক-কে যখন আমরা বহু দেখি, তখন তা ভ্রান্তির বশেই সম্ভব হয় (ভারতীয় দর্শনে যা 'মায়া')।'

এই যে অতীন্দ্রিয়, কারণাতীত চেতনা যাকে লোকোত্তর চেতনা বলা যায়, এই অনুভূতি লাভ করেছিলেন ভগবান বুদ্ধ আড়াই হাজার বছর আগে এক পবিত্র পূর্ণিমারাত্রে। তাঁর সেই অনুভূতি তিনি শিষ্যদের কাছে বলেছিলেন ঃ (সূত্ত-পীটক মজ্ঝিমা নিকায় সূত্ত ২৬ ঃ আর্য পরিয়েশণ সূত্ত)

'অহংভাবের পরিপূর্ণ অবলুপ্তির ফলে যে পরমা শান্তি তা আমি লাভ করেছি...এই শান্তি জরা,...ব্যাধি,...মৃত্যু,...শোক, এমনকি কোন কালিমার দ্বারা প্রভাবিত নয়। দৃষ্ট বস্তুর মতো আমার মধ্যে জ্ঞান প্রকাশিত হলো। বিমুক্তি সম্ভব হলো, কার্যকারণের বন্ধন ছিন্ন হলো বা জাতি বিনষ্ট হলো। পুনর্ভব বা পুনর্জন্ম রুদ্ধ হলো।'

পুনরায় ঘোষণা করেছেন ঃ

'শোন, সন্ন্যাসিবৃন্দ, আমি সেই অমৃতত্ব লাভ করেছি। আমি শিক্ষা দিতে এসেছি, সত্যের পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।'

শ্রাবস্তীর জেতবনে অন্য একটি আলোচনার প্রসঙ্গে বুদ্ধ তাঁর 'লোকোত্তর' বা 'তুরীয়' অবস্থায় নির্বাণের যে অনুভূতি হয়েছিল, তা অপূর্ব শব্দরাশির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন ঃ ('উদান', উডওয়ার্ডের অনুবাদ থেকে)

"ভ্রাতৃবৃন্দ, যা জাত হয় নি, সৃষ্ট হয় নি বা পরিণত হয়ে ওঠে নি বা কোন কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয় নি তার অস্তিত্ব বর্তমান। যদি এই অজ,

অসৃষ্ট, অ-যৌগিকের অস্তিত্ব না থাকত, তবে যা কিছু জাত, সৃষ্ট, পরিণত বা যৌগিকরূপে প্রকাশিত তার থেকে মুক্তি সম্ভব হতো না।

'কিন্তু যেহেতু এই অজ, অসৃষ্ট, অ-পরিণত ও অ-যৌগিকের অস্তিত্ব আছে তাই এই জাত, সৃষ্ট, পরিণত, যৌগিক বস্তুনিচয়ের থেকে মুক্তিও আছে।'

মাণ্ডূক্য উপনিষদ্-কারিকায় গৌড়পাদ ব্রহ্মকে কার্যকারণের অতীত এবং বিশুদ্ধ চেতনারূপে ব্যাখ্যা করেছেন : (৩/৩৩)

'অকল্পকমজং জ্ঞানং জ্ঞেয়াভিন্নং প্রচক্ষতে।
ব্রহ্ম জ্ঞেয়মজং নিত্যমজেনাজং বিবুধ্যতে ॥'

—যখন কার্যকারণে শৃঙ্খল থেকে এবং তাত্ত্বিক সীমারেখা থেকে জ্ঞান বিমুক্ত হয় তখন সেই জ্ঞান জ্ঞাতব্য শাশ্বত সত্য থেকে আর পৃথক থাকে না। ব্রহ্মই সেই সত্য, শাশ্বত ও কারণাতীত। সেই শাশ্বত কারণাতীত সত্যকে শাশ্বত ও কারণাতীত জ্ঞানই অনুভব করতে পারে।

এই উচ্চতম সত্যকে যিনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, সেই গুরুপদবাচ্য মানুষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে গৌড়পাদ বলছেন (তদেব ৪/১) :

'জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্মান্ যো গগনোপমান।
জ্ঞেয়াভিন্নেন সম্বুদ্ধস্তং বন্দে দ্বিপদাং বরম্ ॥'

—সেই মনুষ্যশ্রেষ্ঠকে আমি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি, যিনি তাঁর শুদ্ধজ্ঞানের সহায়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বস্তুনিচয় ও জ্ঞাতব্য ব্রহ্মবস্তুর মধ্যে এক অনন্ত চেতন সত্তাকেই অনুভব করতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—

'শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি আর শুদ্ধ আত্মা—একই জিনিস।'

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ তার বর্ণময় ব্যাখ্যায় এই জগতের শক্তিসমুদয়কে 'প্রাণ'-রূপে আখ্যা দিয়েছে ও সত্য বলে চিহ্নিত করেছে। আর

আত্মাকে বলেছে 'সত্যস্য সত্যম্' বা সত্যের চেয়েও উচ্চতর সত্য ঃ (২/১/২০)

> 'স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা
> বিস্ফুলিঙ্গাব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে
> প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি
> ব্যুচ্চরন্তি তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা
> বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ ॥'

—মাকড়সা যেমন নিজের শরীর থেকে অন্তর্গত তন্তুকে আশ্রয় করে বিচরণ করে কিংবা আগুন থেকে ছোট ছোট স্ফুলিঙ্গ ইতস্তত বিকীর্ণ হয়, ঠিক তেমনি এই আত্মা থেকে সকল ইন্দ্রিয়, সকল লোক, সকল প্রাণী নানাভাবে উৎপন্ন হয়। সেই আত্মার উপনিষৎ সত্যের সত্য ; প্রাণশক্তি সত্য, আত্মা তাদের সত্য।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ (১/২/১১) তত্ত্ববিদ্দের কথা বলেছে। তত্ত্ববিদ্ বা সত্য জেনেছেন যাঁরা তাঁরা সত্যকে উপস্থাপন করেছেন 'অদ্বয়ং জ্ঞানম্' অর্থাৎ অদ্বয় জ্ঞান বা শুদ্ধ জ্ঞান বা শুদ্ধ চেতনারূপে।

এই শাশ্বত ঐক্যকে বোধে আনার জন্য যে বৈজ্ঞানিক বিচারধারা অনুসরণ করা হয়, বেদান্ত তাকে বলছে 'অবস্থাত্রয়-প্রক্রিয়া' বা তিনটি অবস্থাকে আশ্রয় করে যে বিশ্লেষণ। এই বিচারধারা সত্যকে সর্বত্র অনুসন্ধান করতে অগ্রসর হয়, বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে, কর্মের বিষয় ও কর্মের কর্তায়, প্রকৃতির বাইরে ও অভ্যন্তরে।

কিন্তু যুক্তিবিচার যখন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন সে আধ্যাত্মিকতা ও কুসংস্কারে প্রভেদ করতে পারে না। আর তখনই যুক্তিবাদ অন্ধের মতো উভয়ের সঙ্গেই লড়াই বাধিয়ে বসে। আজ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান আরও বিস্তৃত হয়েছে, তাই অজানা সত্যের অনুসন্ধানে সে আকৃষ্ট হয়েছে

ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই পথ অনুসরণ করছে।

সত্যকে যখন বহুধাবিভক্ত করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, শিল্পকলার ক্ষেত্রে, ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা করে দেখা হয়, তখন সত্য সীমাবদ্ধ নয়, তাকে দেখার যে যুক্তিবাদী দৃষ্টি সেই দৃষ্টিই সীমাবদ্ধ।

তবে গবেষণা ও বিশ্লেষণের কারণে অনেকসময় এই ধরনের একটা ভেদরেখা টানা যেতে পারে, যেমন সারা পৃথিবী বেষ্টন করে রয়েছে যে সমুদ্র তাকে আমরা ভিন্ন দেশে ভিন্ন নাম দিয়েছি। কিন্তু এই ভেদরেখাকেই শেষ কথা বলে ধরে নিলে সত্য আমাদের সামনে প্রতিভাত হবে না। বেদান্তমতে দার্শনিক যুক্তিবিচারের সবচেয়ে বড় কাজ এই জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার বিচিত্র শাখাপ্রশাখার মধ্যে এক সমন্বয় সাধন করা ও একটা সামগ্রিক সত্যের অনুসন্ধান করা। বেদান্তের বস্তুবিচার এই সামগ্রিক সত্যে অনুসন্ধানী ঋষিগণকে পৌঁছে দিয়েছে। এই অবস্থায় শুধু ধর্মমতগুলির মধ্যে নয়, এমনকি ধর্ম, বিজ্ঞান, কলা ইত্যাদি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যেও এক সমন্বয় আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐক্যের এই বৈদান্তিক দৃষ্টিতে যুক্তি ও বিশ্বাস, ভক্তি ও জ্ঞান, কাব্য ও দর্শন, কলা ও বিজ্ঞান পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে সক্ষম হয়েছে। আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ এই বৈদান্তিক সত্যকে জগতে সকলের সামনে রেখেছেন যাতে দার্শনিক সূক্ষ্মবিচার বা শুদ্ধবুদ্ধি ঐক্যকে বাস্তবে রূপদান করতে পারে জীবনের সর্বস্তরে। ভগিনী নিবেদিতা এই প্রসঙ্গে লিখছেন (বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, ভূমিকা-অংশ) ঃ

"তাঁর কাছে মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন প্রভেদ নেই, তাঁর নিকট পৌরুষে ও বিশ্বাসে—যথার্থ সদাচারে ও আধ্যাত্মিকতায় কোন পার্থক্য নেই। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে তাঁর সকল বাণীই এই মুখ্য প্রত্যয়ের ভাষ্য বলে বোধ হয়। এক সময় তিনি বলেছিলেন, 'চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম—একই সত্যকে প্রকাশ করার তিনটি উপায়। কিন্তু এটি বুঝতে গেলে আমাদেরকে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করতে হবে।' "

৪৪ আধুনিক পদার্থবিদ্যা ও দার্শনিক বিচারধারা

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যে ধারণা মানুষ অনুসন্ধান করে চলেছে তারই দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে পদার্থবিদ্যার প্রত্যেকটি শাখার বিস্তৃতিলাভের নিরন্তর প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞান তার যাত্রা শুরু করেছিল বহিঃপ্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের মধ্য দিয়ে; কিন্তু এই যুগান্তব্যাপী অনুসন্ধানের বর্তমান পর্যায়ে বিজ্ঞান এসে দাঁড়িয়েছে মানুষের অন্তর্জগতের রহস্যের সামনে। আজ গভীরতম রহস্য হয়ে দাঁড়িয়েছে মানুষের মন, তার চেতনা। প্রাচ্যদর্শন, বিশেষত ভারতবর্ষের বেদান্তশাস্ত্র ও বৌদ্ধদর্শন এই রহস্যের মুখোমুখি হয়েছিল আজ থেকে দু-হাজার বছরেরও বেশি আগে। অন্তর্জগতের গভীরে তাঁরা ডুব দিয়েছিলেন সত্যের সন্ধানে। আর আধুনিক কালে আমরা দেখছি সত্য অনুসন্ধানের প্রত্যক্ষ প্রয়াস ও পরোক্ষ প্রয়াস উভয়েই মিলিত হয়ে এক দর্শনের জন্ম দিচ্ছে যেখানে বহুর মধ্যে চলেছে একের অনুসন্ধান।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের অগ্রণী পদার্থবিজ্ঞানীরা কোয়াণ্টাম-তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতাবাদের আবিষ্কারকে স্বাগত জানালেন, ঐ আবিষ্কারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং এক একজন সাহসী দার্শনিক হয়ে উঠলেন। পদার্থবিজ্ঞানের যুক্তিবিচার দার্শনিক যুক্তিবাদ বা 'বুদ্ধি'-রূপে বিকশিত হয়ে উঠল। তখন গবেষণা করতে গিয়ে বহির্জগতের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যাদির সঙ্গে দ্রষ্টা মানুষকেও বিবেচনা করা আরম্ভ হলো। বৈজ্ঞানিক এডিংটন, জিন্‌স, ম্যাক্‌স প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইন, শ্রডিংগার, নীল্‌স বোর, হাইজেনবার্গ থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর সমস্ত অগ্রণী পদার্থবিজ্ঞানীরা এই দার্শনিক জিজ্ঞাসার পথ খুলে দিলেন। এই বিকাশের পথ ধরে বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ডঃ ফ্রিট্‌জফ কাপ্রা কয়েক বছর আগে লিখলেন "পদার্থবিদ্যার 'তাও' " (The Tao of Physics)।

দেশ, কাল ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ওপর আলোচনা করতে গিয়ে

এডিংটন ইঙ্গিত দিলেন কিভাবে বহিঃপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে মানুষের অন্তর্জগতের রহস্য উন্মোচনের বিষয়টি এসে পড়ছে ঃ

'আপেক্ষিকতাবাদের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পদার্থবিদ্যার বিষয়টি নতুন করে পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে। পদার্থবিজ্ঞানের যে তত্ত্বগুলি তাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও প্রয়োগের উৎকর্ষে মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডারে সগর্বে রক্ষিত, সেই তত্ত্বগুলিকে এখন সমন্বিত করা সম্ভব হয়েছে। তবে বস্তুর গভীরে প্রবেশ করলে দেখছি যে এই অর্জিত জ্ঞান বস্তুর বাইরের গঠনের জ্ঞান, কতকগুলি চিহ্নের দ্বারা প্রকাশিতমাত্র—বস্তুর ভেতরের সারবস্তুর জ্ঞান নয়। সমগ্র বিশ্বচরাচর জুড়ে সেই অজানা সারবস্তু। সেটা নিশ্চয়ই আমাদের চেতনার একটা রূপ বা অংশ। এই যে একটি দিক পদার্থবিদ্যার গবেষণায় উঠে এল, এটি তো পদার্থবিজ্ঞানের প্রচলিত অনুসন্ধানের পদ্ধতিতে জানার নয়। তাছাড়া বিজ্ঞানের গবেষণা যখন সূক্ষ্মস্তরে এগিয়ে গেছে তখন আমরা তো লক্ষ্য করছি যে মন প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যে যা প্রদান করছে, সেটাই আবার প্রকৃতি থেকে নিয়ে সমৃদ্ধ হচ্ছে। এই অজানা জগতের অনুসন্ধানে নিয়ত আমরা এক অজানা হস্তক্ষেপ লক্ষ্য করছি। এবার তার উৎস খুঁজতে গিয়ে আমরা নির্মাণ করে চলেছি একের পর এক তত্ত্ব। এই যাত্রাপথে ঐ অজানা হস্তক্ষেপটি কার, সে আমরা অবশেষে খুঁজে বের করেছি। আর তাই খুঁজে বার করতে গিয়ে দেখছি, সে আমাদেরই অন্তর্সত্তা।'

দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের এই পর্যবেক্ষণ আরো স্পষ্ট হয়েছে এ-যুগে ডাঃ কাপ্রার লেখায়। তাঁর লেখা 'পদার্থবিদ্যার তাও' এই নামকরণটিই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া তাঁর উপস্থাপনার অপূর্ব ভঙ্গিও আমাদের আকৃষ্ট করে। তাঁর গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ

'প্রাচ্যের বিশ্বদৃষ্টির মূল সূত্রগুলি ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ বিশ্বদৃষ্টির মূল সূত্রগুলি একই।'

এবং তিনি আরও বলছেন ঃ

'প্রাচ্যচিন্তা, বিশেষত মরমী সাধকদের যে চিন্তা, তার মধ্যেই প্রচলিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির একটা সঙ্গতিপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক দার্শনিক পশ্চাৎপট খুঁজে পাওয়া যায়।' (The Tao of Physics, p. 25)

গত দুই শতাব্দী ধরে বিজ্ঞানের জগতে জড়বাদী দর্শন ও যান্ত্রিক কলাকৌশলের ওপর নির্ভরতা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে ও সেইসঙ্গে এসেছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যন্ত্রনির্ভরতা। কাপ্রার মতে, এর ফলে মানুষের কাছে বিজ্ঞানের সম্পর্কে মানুষের ধারণাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাপ্রা বিজ্ঞানকে সেই মর্যাদায় ফিরিয়ে আনতে চান, যেখানে শুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চা হবে সত্যের অনুসন্ধান ও মানুষের আন্তরশক্তির পূর্ণ বিকাশ নিয়ে। সেখানে মানুষের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে নয়, বরং তাকে সঙ্গে নিয়ে, বিশেষত প্রাচ্যদেশে যে আধ্যাত্মিক চিন্তার সূত্র পরিলক্ষিত হয়, তাকে সঙ্গে নিয়ে চলবে বিজ্ঞানের গবেষণা ঃ (তদেব)

"এই বই বিজ্ঞানের ধারণাকে মানুষের কাছে আরও উন্নত করতে চায় কারণ প্রাচ্যের প্রজ্ঞা ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান, এই উভয়ের মধ্যে আছে এক অপরিহার্য সমন্বয়। এই বই দেখাতে চেয়েছে, কারিগরি কলাকৌশলের সীমারেখা পেরিয়ে আধুনিক পদার্থবিদ্যা অনেক দূর এগিয়ে গেছে সেখানে পদার্থবিদ্যার পথ বা 'তাও' হয়ে দাঁড়িয়েছে আত্মোপলব্ধির পথ, আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনের পথ।"

বেদান্ত বলেছিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক মরমী সাধকদের কথাতেও উঠে এসেছিল যে সত্যের মূল অনুসন্ধানের পথ মানুষকে ইন্দ্রিয়ের অতীতে নিয়ে চলে, জগৎ থেকে জগদতীত সত্যের দিকে আকর্ষণ করে। কাপ্রার গবেষণায় এই বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি পাই ঃ (তদেব, পৃঃ ৫১)

'ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রের সন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানের প্রথম পদক্ষেপ পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ। পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে

বিজ্ঞানকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার সীমা অতিক্রম করতে হয়। কারণ এখান থেকেই শুধুমাত্র সাধারণ জ্ঞান ও লৌকিক যুক্তিবাদী জ্ঞান দিয়ে আর গবেষণা এগোতে পারে না। পরমাণুবিজ্ঞান এই পর্যায়ে এসে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ আসলে কি, এই অনুসন্ধানকে জাগিয়ে তোলে। বিজ্ঞানীরা তখন মরমী সাধকদের মতো সত্যের ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি কি এইটা খুঁজতে থাকেন। আধুনিক পদার্থবিদ্যা তখন পদার্থের যে প্রতিচ্ছায়া ও প্রতিরূপ গড়তে থাকে তা অনেকটা প্রাচীন প্রাচ্য দর্শনের প্রকল্প ও সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে মিলতে থাকে।'

প্রাচ্যের মরমী সাধককুলের দার্শনিক জিজ্ঞাসা এবং আধুনিক পদার্থবিদ্যার সূক্ষ্ম গবেষণা, উভয়েই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে ঐক্যের অনুসন্ধান করে চলেছে তা উল্লেখ করে কাপ্রা বলছেন ঃ (তদেব, পৃঃ ১৩০-৩১)

"প্রাচ্যের বিশ্বদৃষ্টির প্রধান মূল বৈশিষ্ট্যটি হলো ঐক্যের চেতনা এবং সমস্ত বস্তু ও ঘটনাবৈচিত্র্যের এক নিবিড় পারস্পরিক সম্পর্ক।... যা কিছু সৃষ্ট তা এক অবিভাজ্য সত্তার প্রকাশ ছাড়া কিছু নয়, এই সত্য বারবার উঠে এসেছে প্রাচ্য জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায়। এই অবিভাজ্য অনন্ত সত্তাকে হিন্দুধর্ম নাম দিয়েছে 'ব্রহ্ম', বৌদ্ধধর্ম নাম দিয়েছে 'ধর্মকায়', তাওবাদে 'তাও', ...। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐক্য শুধুমাত্র মরমী সাধকদের অনুভূতির বিষয় নয়, আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারও বটে। পরমাণু-গবেষণায় প্রথম প্রথম ঐক্যের ধারণা থাকে ওপর-ওপর, পরে এই ধারণা সত্যে পরিণত হয় যখন সূক্ষ্ম বিচার এগিয়ে চলে পরমাণু কণাগুলির আচরণ অনুধাবন করে। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও প্রাচ্যদর্শন এই উভয়ের তুলনা করতে গিয়ে ঐ সর্বজনীন ঐক্যের বিষয়টি উঠে এসেছে বারবার।"

উভয়ই সত্যকে অনুসন্ধান করতে গিয়ে অতিক্রম করতে চেয়েছে দেশ, কাল এবং কার্যকারণের সীমারেখা। ডঃ কাপ্রা উভয়ের এই আত্মীয়তাকে স্বাগত জানিয়ে বলছেন ঃ (তদেব, পৃঃ ১৮৬-৮৭)

'আপেক্ষিকতাবাদের ওপর নির্ভর করে পদার্থবিদ্যার গবেষণা যখন এগোতে থাকে, তখন দেশকালের মাত্রাকে রুদ্ধ করে কালাতীত এক দেশ বা ভূমি বা আকাশের কল্পনাকে আশ্রয় করতে হয়। সূক্ষ্ম বিচারের এই ভূমিতে দাঁড়িয়ে একটি ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় কিন্তু কোন কার্যকারণকে সুনির্দিষ্ট করা যায় না। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেশ ও কালের যে অবস্থান তার গতিকে যখন সুনির্দিষ্ট রাখি, তখন একটি পরমাণু-কণার সঙ্গে অপর কণার পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। এইভাবেই গবেষণা এগোয়। কিন্তু কালাতীত ভূমিতে দাঁড়িয়ে পূর্বাপর সম্পর্ক স্থির করা যায় না, ফলে কার্যকারণও ভিত্তিহীন হয়ে যায়।

'অনুরূপভাবেই প্রাচ্য দার্শনিকেরা তাঁদের দার্শনিক বিচারে কালাতীত ভূমির কথা বলেছেন সেখানে কার্যকারণ বলে কিছু থাকে না। সাধারণত আমরা এই দেশকালের মধ্যে বিচরণ করেই প্রত্যেকটি বস্তু ও প্রত্যেকটি ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করি ও ব্যাখ্যা করি। আমাদের এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দেশকালের অধীন জগতের ধারণা থেকেই আমাদের ব্যাখ্যা উঠে আসে। কিন্তু এই কার্যকারণ ও তার ধারণা ভ্রান্ত হয়ে পড়ে যখন আমাদের অনুসন্ধান দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে যায়। এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে ঃ (Jnana Yoga, p. 169)

' "পরম সত্যকে আমরা দেখি একটা কাঁচের মধ্য দিয়ে। সে কাঁচ হলো দেশ, কাল ও কারণ-সূত্র।...পরম সত্য কিন্তু দেশ, কাল এবং কার্যকারণের অতীত।"

'প্রাচ্যদেশগুলির যে আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য (যেমন হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মে লক্ষ্য করা যায়), যেখানে সাধকদের নানা মার্গের সন্ধান দেওয়া হচ্ছে সেখানে কার্যকারণের সীমা, কালের সীমাকে অতিক্রম করার ও

কর্মবন্ধনকে ছিন্ন করার প্রেরণা বর্তমান। প্রাচ্যদর্শনকে যদি এই কালের সীমা অতিক্রম করে মুক্ত হবার পথ বলে আখ্যা দেওয়া যায়, তাহলে আধুনিক আপেক্ষিকতাবাদ পরবর্তী যে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক গবেষণা সে-ও এই পথের পথিক।'

তিনি আরও বললেন ঃ (তদেব, পৃঃ ২১১)

"বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ক্ষেত্রতত্ত্ব উদ্ভাবনের পর ক্রমশ পদার্থবিদেরা বিভিন্ন ক্ষেত্র, যথা চৌম্বক বা বৈদ্যুতিক ইত্যাদি সব ক্ষেত্রগুলিকে একটি সাধারণ ক্ষেত্রে একীভূত করা যায় কি না সে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে বিভিন্ন ঘটনাকে একটি ক্ষেত্রের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা যায়। জীবনের শেষ কটি বছর আইনস্টাইন এইরূপ একটি সমন্বিত সাধারণ ক্ষেত্রের অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন। একমাত্র হিন্দুদের 'ব্রহ্ম' বা বৌদ্ধদের 'ধর্মকায়' অথবা তাওবাদীদের 'তাও'-কেই সম্ভবত এইরকম একটি সাধারণ ক্ষেত্র নামে বিশেষিত করা যায় যার সাহায্যে শুধুমাত্র পদার্থবিদ্যার নয়, সব ঘটনাকেই ব্যাখ্যা করা চলে।

"প্রাচ্যদৃষ্টিতে ঘটনাবলীর পেছনে যে সত্তা তা নিরাকার, নিরপেক্ষ এবং বাক্য ও মনের অতীত। তাই কখন কখনো একে 'শূন্য'ও বলা হয়। কিন্তু এই শূন্যতার অর্থ অস্তিত্বের অবলুপ্তি নয়। বরং এরই মধ্যে রয়েছে সমগ্র অস্তিত্বের বীজ, সমস্ত রূপ-বৈচিত্র্যের মূল উপাদান। তাই উপনিষদে পাই ঃ (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৪/১০/৪)

"'ব্রহ্ম প্রাণ, ব্রহ্ম আনন্দ
ব্রহ্ম আকাশ...
আনন্দ আকাশ,
এই আকাশ যা তাই-ই আনন্দ।'"

পরমাণুবিজ্ঞান চেতনার অনুসন্ধান করতে গিয়ে 'দর্শক বা কর্মের কর্তা'র ভূমিতে নেমে এসেছে। বৈজ্ঞানিক জন হুইলারের ভাষায় নতুন একটি

মাত্রা সংযোজিত হয়েছে এই বিশ্লেষণে, আর তা হলো 'অংশগ্রহণকারী সততা'। তাই ডঃ কাপ্রা লিখলেন ঃ (তদেব, পৃঃ ৩৯)

'আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে পরমাণুর ধর্ম অনুধাবন করতে গিয়েই এসে পড়েছে চেতনার কথা। কোয়াণ্টাম-তত্ত্ব পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে পরমাণুর আভ্যন্তরীণ ঘটনাগুলি যে পদ্ধতিগুলি ধরে বোঝার চেষ্টা করলে আমাদের পক্ষে বোধগম্য হয় সেই পদ্ধতিগুলি পর্যবেক্ষক-সত্তাকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ নয়। ইউজেন উইগ্‌নারের ভাষায় ঃ (Symmetries and Reflections—Scientific Essays, p. 172)

'"চেতনাকে বাদ দিলে কোয়াণ্টাম-তত্ত্বের আবিষ্কৃত সিদ্ধান্তগুলিকে সূত্রে গ্রথিত করা যায় না।"

'কোয়াণ্টাম-তত্ত্বের যে সূত্রগুলি বৈজ্ঞানিকেরা প্রায়োগিকভাবে গ্রথিত করেছেন, তাতে তাঁরা চেতনার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে নজরে রাখেন নি। কিন্তু উইগ্‌নার ও অন্যান্য পদার্থবিদেরা এই প্রসঙ্গে বলতে চেয়েছেন যে বস্তুকে বিশ্লেষণ করার এই পথে মানুষের চেতনাকে গ্রহণ না করে এগোনো যাবে না।

'বিজ্ঞানের এই বিকাশ এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয় যখন পদার্থবিদ্যার সঙ্গে প্রাচ্যদর্শনের এক মেলবন্ধন ঘটে। অধ্যাত্ম-অনুভূতির যে জগৎ তার প্রথমেই আসে মানুষের চেতনার সঙ্গে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চিরন্তন সম্পর্কের অনুভূতি।...যদি পদার্থবিজ্ঞানীগণ তাঁদের গবেষণায় মানবিক চেতনাকে ধরে নিয়ে গবেষণা বিকশিত করতে চান, এই প্রাচ্যদেশীয় ধ্যানধারণা তাঁদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে উৎসাহিত করবে।'

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাসূত্রকে সমর্থন করে (যা আমরা ইতোমধ্যেই ২২তম পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করেছি) ডঃ কাপ্রা এই বিষয়টি উত্থাপন করেছেন, কেমন করে পদার্থবিজ্ঞানী ও অধ্যাত্মসাধক একই সত্যের দিকে অগ্রসর হয়েছেন বিভিন্ন পথ ধরে। ডঃ কাপ্রার কথায় ঃ (তদেব, পৃঃ ৩০৫)

'সাধকদের পথ থেকে ভিন্নভাবে পদার্থবিজ্ঞান তাঁর অনুসন্ধান শুরু করেন বস্তুর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের গবেষণায়। বহির্বিশ্বে পদার্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তিনি সমস্ত বস্তুর ও সমস্ত ঘটনার মধ্যে একটা অপরিহার্য ঐক্যের সন্ধান পান। শুধু তাই নয়, তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে তিনি নিজে এবং তাঁর চেতনা এই ঐক্যেরই এক অংশমাত্র। এই সিদ্ধান্ত এবং সাধকের সাধনার সিদ্ধান্ত একই। একজন শুরু করেছিলেন তাঁর অন্তর্জগৎ নিয়ে, অন্যজন বহির্জগতের বিশ্লেষণে। দুটি দৃষ্টিভঙ্গির এই যে ঐক্য এর থেকে আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনে উপলব্ধ সত্যটিকে সমর্থন করতে সক্ষম হই। সে সত্য হলো এই যে অন্তরাত্মাই সর্বভূতান্তরাত্মা বা ব্রহ্ম।'

৪৫ উপসংহার

এতক্ষণ আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করলাম, সেই দৃষ্টিতে বিজ্ঞান ও ধর্মে, ভৌতবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানে কোন বিরোধ নেই। সত্যের অনুসন্ধান ও মানুষকে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিকে পূর্ণরূপে বিকশিত করে তোলা, এই হলো উভয়ের লক্ষ্য। প্রতিটিকে আলাদা করে ধরলে তা অপূর্ণ ও মানবজাতির পূর্ণ বিকাশসাধনে অসহায়। মানবজাতির ইতিহাসে আলাদাভাবে এই চেষ্টা করা হয়েছে, যদিও ফলন আশানুরূপ নয়। প্রাচীন সভ্যতা মূলত ধর্মজগৎ থেকেই প্রেরণা সংগ্রহ করেছিল, তাদের প্রাপ্ত ফলাফল আংশিক। অন্যদিকে আধুনিক সভ্যতা পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করেছে বিজ্ঞানের ওপর। মানুষের জীবনে এই দুটি বিকাশের ধারা তাদের সব শক্তি নিয়ে যদি পরস্পরকে সঞ্জীবিত করে তবেই এক পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে ও আজকের পৃথিবী যে উজ্জ্বল মানবসভ্যতার স্বপ্ন দেখে তা বাস্তবায়িত হয়। আধুনিক যুগে এই অমূল্য চিন্তার সংযোজন সম্ভব করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর বৈদান্তিক সিদ্ধান্তকে তিনি প্রকাশ করেছেন সংক্ষিপ্ত

অথচ অনুপম ভাষায় ঃ (বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৫)

'আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম।

'বাহ্য প্রকৃতি (যথা ভৌতবিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সামাজিক তথা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঞ্জীবনীর মধ্য দিয়ে) ও অন্তর প্রকৃতিকে (যথা নৈতিক, নান্দনিক ও ধর্মীয় পদ্ধতি অনুসরণ মাধ্যমে) বশীভূত করে আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।

'কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—এদের মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায় দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও।

'এটাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ তার গৌণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।'

মানুষের অন্তরের প্রকৃত ঐশ্বর্যকে অনুভব করার পদ্ধতিকে অনুসরণ করেছে তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং ঔপনিষদিক নিরাসক্তি। বুদ্ধ থেকে রামকৃষ্ণ, যুগে যুগে চলেছে এই আধ্যাত্মিক অভিযাত্রা—সেই ঐতিহ্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের এই অমর শ্লোকগুলির (২/৫ ও ৩/৮) মধ্য দিয়ে ঃ

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥
বেদাহমেতং পুরুষম্ মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায় ॥"

বিজ্ঞান ও ধর্মের আলোচনার উপসংহার এই শ্লোক উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সবচেয়ে ভালোভাবে হতে পারে।

মানুষের মহামুক্তির বিষয়টি নির্ভর করে আছে মানুষ কোন্ পথ বেছে নেবে তার ওপর—জড়বিজ্ঞানের কার্যকারণে দোলায়মান ব্যক্তিত্বের

অনুসরণ, না অন্তরাত্মার মুক্তির একান্ত ব্যাকুলতা। আধুনিক যুগের স্নায়ুতত্ত্ব ও মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা চলেছে এই সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে ভারতবর্ষ এই সমস্যার সমাধান করেছে উপনিষদের যুগে আজ থেকে বহু হাজার বছর আগে। যে শ্লোক আমরা উদ্ধৃত করেছি, তারই আলোকে আজকের যুগে দাঁড়িয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৯৩ সালে অনুষ্ঠিত চিকাগো বিশ্বধর্মমহাসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার এটি একটি অংশবিশেষ : (বাণী ও রচনা ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮)

"প্রচণ্ড, বায়ুমুখে ক্ষুদ্র তরণী যেমন একবার ফেনময় তরঙ্গের শীর্ষে উঠছে, পরক্ষণেই মুখব্যাদনকারী তরঙ্গ-গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, সেইরূপ আত্মাও কি সদসৎ কর্মের একান্ত বশবর্তী হয়ে একবার উঠছে ও একবার পড়ছে?... এটি ভাবলে মন দমে যায় কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মই এই। পরিত্রাণের কি কোন পথ নেই?

মানবের হতাশ হৃদয়ের এরকম ক্রন্দনধ্বনি উঠতে লাগল, করুণাময়ের সিংহাসন সমীপে তা উপনীত হলো, সেখান থেকে আশা ও সান্ত্বনার বাণী নেমে এসে এক বৈদিক ঋষির হৃদয় উদ্বুদ্ধ করল। বিশ্বসমক্ষে দাঁড়িয়ে ঋষি তারস্বরে এই আনন্দ-সমাচার ঘোষণা করলেন, 'শোন, শোন, অমৃতের পুত্রগণ, কোন দিব্যলোকের অধিবাসিগণ, আমি সেই পুরাতন মহান্ পুরুষকে জেনেছি। আদিত্যের মতো তাঁর বর্ণ, তিনি সকল অজ্ঞান-অন্ধকারের পারে ; তাঁকে জানলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, আর অন্য পথ নেই।'

" 'অমৃতের পুত্র'—কি মধুর ও আশার নাম! হে ভ্রাতৃগণ, এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করতে চাই। তোমরা অমৃতের অধিকারি। হিন্দুরা তোমাদের পাপী বলতে চায় না। তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারি—পবিত্র ও পূর্ণ। মর্তভূমির দেবতা তোমরা—পাপী? মানুষকে

পাপী বলাই এক মহাপাপ, মানুষের যথার্থ স্বরূপের ওপর এটা মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ। উঠে এসো, সিংহস্বরূপ হয়ে তোমরা নিজেদের মেষতুল্য মনে করছ। তোমরা অমর আত্মা, মুক্ত আত্মা—-চির-আনন্দময়। তোমরা জড় নও, তোমরা দেহ নও ; জড় তোমাদের দাস, তোমরা জড়ের দাস নও।"

বিশ্বাস ও যুক্তি *

১ প্রাক্‌কথন

আজকের সন্ধ্যায় আমাকে 'বিশ্বাস ও যুক্তি' এই বিষয়টির ওপর বলতে বলা হয়েছে। আশ্রমের এই শান্ত, পবিত্র ও উদ্দীপক পরিবেশে বক্তা ও শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনায় স্বভাবতই উৎসাহিত হন। মহৎ ভাবের অনুধ্যানকে সাহায্য করে এইরূপ সুন্দর পরিবেশ ও শান্ত সন্ধ্যা।

দিল্লী ও শ্রীনগর যাবার পথে গোয়ালিয়রে আবার আসতে পেরে ও দুদিন আপনাদের সকলের সঙ্গে কাটাতে পেরে আমি আনন্দিত। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতার সূত্রে যে বিস্তৃত ভ্রমণসূচী, তার মধ্যে বাঙ্গালোর, বোম্বাই ও ইন্দোর শেষ করে এসেছি। প্রত্যেক জায়গায় এই ধরনের সভা হয়েছে যেখানে শত শত মানুষ, উপস্থিত হয়েছে আমাদের দেশের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ঐতিহ্যকে বোঝবার চেষ্টায় এবং সেইসঙ্গে আধুনিক যুগে সেই ঐতিহ্য কতটা প্রাসঙ্গিক এটাও তারা বুঝতে চেয়েছে। এই প্রসঙ্গে আজকের সন্ধ্যার বিষয় 'বিশ্বাস ও যুক্তি' নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

২ বিশ্বাস ও যুক্তির সংঘাত
(একটি পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতা, ভারতীয় নয়)

ইংরেজীতে আমরা বলছি Faith and Reason। সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু এর থেকে অনেক সুন্দর শব্দের সাহায্যে ধারণাকে পরিস্ফুট করা হয়েছে। 'Faith'-এর পরিবর্তে সঠিক শব্দটি হলো 'শ্রদ্ধা'—এটি আমাদের ঐতিহ্যের ইতিহাসে একটি অর্থবহ শব্দ, 'Faith' বা বিশ্বাস থেকে অনেক গভীর ও অর্থপূর্ণ। 'Reason' কে সংস্কৃতে অনূদিত করলে দাঁড়ায় যুক্তি, উপপত্তি বা বুদ্ধি। এখন এই 'বিশ্বাস' ও 'যুক্তি'— এ-দুটির পারস্পরিক সম্পর্ক কি দাঁড়ায়? পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে আমরা লক্ষ্য করি, মানব সভ্যতার আজকাল থেকে উভয়ের মধ্যে সংঘাত বর্তমান। ভারতবর্ষে আমাদের অধিকাংশের শিক্ষাদীক্ষা পাশ্চাত্য প্রথায়, তাই আমাদেরও ধারণায় উভয়ের মধ্যে চিরকালই সংঘাত ছাড়া কিছু নেই।

আজকের দিনে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই সম্পর্কটিকে বোঝবার সময় হয়েছে। তবেই আমরা অনুভব করতে পারব যে সত্য অনুসন্ধানের পথে এই দুটির অবিচ্ছিন্ন ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক প্রয়োজনীয়। আমরা ভেবে দেখি নি যে 'বিশ্বাস' ও 'যুক্তি'র এই আবহমান কাল থেকে চলে আসা সংঘাত শুধুমাত্র বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসে নয় ধর্মসাধনার ইতিহাসেও একটি বৈশিষ্ট্য নিয়েই জাগরূক, বিশেষত পাশ্চাত্য ইতিহাসে। আমরা যদি আমাদের নিজেদের মহান ঐতিহ্যের কথা স্মরণে রেখে আমাদের মনকে প্রসারিত করি, তাহলে দেখব যে শুধুমাত্র এই দুটি বিষয় নয়, মানুষের সত্যের অনুসন্ধান ও জীবনের পূর্ণতালাভে জয়যাত্রাও সার্থক হয় যখন নতুন আলোকে ভৌতবিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পরকে পরিপূরণ করতে এগিয়ে আসে।

৩ পাশ্চাত্যে এই সংঘাতের ইতিহাস

ধর্মের ভিত্তি বিশ্বাস, বিজ্ঞানের ভিত্তি যুক্তিবিচার—এইভাবেই আমাদের স্কুল ও কলেজে শেখানো হয়েছে। এটি পুরোপুরি একটি পাশ্চাত্য দৃষ্টিকোণ। শুধু অতীতে নয় আধুনিক পাশ্চাত্যেও জড়বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক সংঘাতময়। ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের যখন বিরোধ, তখন এই সিদ্ধান্ত উঠে আসে যে—বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তিরও চির বিরোধ। এই অবস্থায় ধরে নেওয়া হয় যে বিশ্বাস মানেই যাদুবিদ্যা, কুসংস্কার ইত্যাদি আর একের বিশ্বাসের সঙ্গে অন্যের বিশ্বাসের সদাই সংঘাত। গ্রীক ও রোমান যুগ থেকে পাশ্চাত্য ইতিহাসে এই উভয়ের সংঘাত এবং এক বিশ্বাসের সঙ্গে অপর বিশ্বাসের সংঘর্ষ প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়। খ্রীস্টের জন্মের আগে সেমিটিক ধর্মের বিস্তারের সময় এক ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অন্য ধর্মবিশ্বাসের যে বিরোধ লেগে থাকত, খ্রীস্টজন্মের পরে সে সংঘাত আরও তীব্র আকার ধারণ করেছিল। সেই তীব্রতা লক্ষ্য করা যায় মধ্যযুগে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ইত্যাদি যুদ্ধবিগ্রহ ও হিংসাত্মক বিদ্বেষের মধ্য দিয়ে। ষোড়শ শতকে যে সংস্কার আন্দোলনের উদ্ভব হলো তার পরেও খ্রীস্টধর্মের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার মধ্যে বিরোধ লেগেই রইল। তিরিশ বছর ধরে চলল ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টদের বিরোধ, সংঘাত, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি।

বিজ্ঞান তথা যুক্তিবাদের সঙ্গে ধর্ম তথা বিশ্বাসের যে সংঘাত সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল গত চারশ বছর ধরে। পাশ্চাত্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে বিজ্ঞানচর্চার প্রাণ যে যুক্তিবিচার, সেই যুক্তিবাদেই ধর্মের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছে। যেহেতু পাশ্চাত্যে ধর্ম ঐ নির্ভরতা বা বিশ্বাসের পথ ধরেই এগিয়েছে, বিজ্ঞান তাকে সযত্নে যুক্তিবাদের বাইরে সরিয়ে দিয়েছে। এখানে ধর্ম মানে কিছু মতবাদ ও প্রথা যা তোমাকে বিশ্বাস করতে হবে; তুমি এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ করবে না,

পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করবে। যুক্তির কাজ এখানে শুধু ঐ বিশ্বাসকে সমর্থন করে যাওয়া।

এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণের সম্পূর্ণ বিপরীত। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতি ঘটনাকে জিজ্ঞাসা করে চলে, অনুসন্ধান চালায় অবারিত পদক্ষেপে ও প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তকে আবার বিচার করে দেখে সঠিক কি না। এই সমালোচকের দৃষ্টি, এই যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসাই হলো আধুনিক বিজ্ঞানের মূল শক্তি। পাশ্চাত্য ইতিহাসে প্রথমদিকে ধর্ম তার গীর্জা আর মতবাদ ইত্যাদি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রবল শক্তিশালীর রূপ নিয়ে। যখনই সমাজে যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসা মাথা তোলার চেষ্টা করেছে, ধর্ম তাকে চেপে দিতে চেয়েছে। কিন্তু প্রথমটা পরাস্ত হতে থাকলেও এই যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসা তথা বিজ্ঞান বিজয়ী হয়েছে ও পরাজিত হয়েছে বিশ্বাস-নির্ভর ধর্ম। এই পরাজয়ের প্রথমদিকে ধর্মবিশ্বাসকে একটা মারাত্মক ভুল বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল, পরে তাকে ক্ষতিকারক নয় এরকম একটা কুসংস্কার বলে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দেওয়া হয়েছে।

৪ ভারতীয় পটভূমিতে এই সংঘাতের অসঙ্গতি

সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখলাম পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ, বিজ্ঞানের নামে যুক্তিবাদী, আর ধর্মের নামে সংকীর্ণমনা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন—এরকম এক অদ্ভুত মিশ্রণে পরিণত। ভারতবর্ষেও আমরা এই পাশ্চাত্য ইতিহাসের ধারা ধরে নিজেদের শিক্ষিত করেছি। ফলে এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আমরা আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যুক্তিবাদী দৃষ্টি আয়ত্ত করে সেই দৃষ্টিভঙ্গি কাজে লাগিয়েছি আমাদের সমস্যাগুলির সমাধানে। তাই নিজেদের যে সনাতন ধর্ম তাকেও তাই মনে হয়েছে কতকগুলি কুসংস্কারের বোঝা, যা আধুনিক সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকে একেবারেই বেমানান। আমরা তখন আমাদের ভারতীয়

সংস্কৃতির যে আধ্যাত্মিক ভিত্তি তাকে প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা করি নি। এর থেকে এসেছে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি ও পন্থার অন্ধ অনুকরণ, তার ইতিবাচক দিকগুলিকে আত্মস্থ না করে সস্তা চাকচিক্যের দুর্বল অনুসরণ। কিছু মানুষ তাই চিন্তাভাবনা ও যুক্তিবিচারকে শিকেয় তুলে দিয়ে প্রচলিত কুসংস্কারগুলিকেই আশ্রয় করেছে ও আধুনিক যুগের জিজ্ঞাসা থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছে। আর এর ফলেই আমাদের কয়েক সহস্রাব্দ-সঞ্চিত ঐতিহ্য ও জাতীয় জীবনের ঐতিহাসিক পরম্পরাকে অব্যাহত রাখতে আধুনিক যুগের সংঘাতের সঙ্গে নিজস্ব পন্থায় মোকাবিলা করার আমাদের যে জাতীয় মানসিকতা, তা সাধারণভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

ঠিক এইরকম এক যুগ-সন্ধিক্ষণে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গর্ভ থেকে উঠে এসেছেন দুজন আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরু, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ। এই সমস্যার সমাধানের অপূর্ব ভারতীয় পথ তাঁরা আমাদের দেখিয়ে দিলেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি আজ শুধু ভারতে নয়, বিদেশেও দেখিয়ে দিচ্ছে যে বিজ্ঞান ও ধর্মের এই বিরোধ, বিশ্বাস ও যুক্তির এই সংঘাত সর্বজনীন সত্য নয়। ভারতীয় সাধনা এমন এক দর্শনের জন্ম দিতে পারে যেখানে সত্যের সাধনা ও জীবনের বিকাশ একটা উদার পটভূমিতে পরিদৃষ্ট হয়। তখন এই সংঘাত এনে জীবনের পূর্ণবিকাশের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার যে মধুর ছন্দ, তাকে বিঘ্নিত করার প্রশ্নই তুলতে দেওয়া হয় না। এই দার্শনিক দৃষ্টি ক্রমশ ভারতীয় মনকে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এই সংঘাত একটা পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতামাত্র, কোন সর্বজনীন সত্য নয়। এই অনুভূতির স্তরে আমাদের সব মানুষকেই উঠে আসতে হবে। বিশ্বাস ও যুক্তি, বিজ্ঞান ও ধর্ম, এই উভয়ের সম্পর্ক নিয়ে সমাজে যে সমস্যা তা আমাদের সমাধান করতে হবে সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে।

ভারতবর্ষের প্রয়োজন আরও অনেক বেশি বিজ্ঞানচর্চা, আরও যুক্তিবাদের প্রসার। কিন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের পথে ও সত্যকে অনুসন্ধান করার পথে আমাদের দেশের যে দীর্ঘ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা তার থেকে আমরা বুঝিতে পারি, আমাদের এই বিজ্ঞানচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ধর্মচেতনাকে উৎসাহ দিতে হবে না। তার কারণ, আমরা উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখি নি, দেখেছি সংযোগ ও মিলন। কি সেই মিলনের সূত্র? প্রত্যেকটি শিক্ষিত ভারতীয়কে এই দৃষ্টিভঙ্গির অনুসন্ধান করতে হবে যার সাহায্যে ভারতবর্ষ এই সমস্যাকে অতিক্রম করে গেছে। আমাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার পাশাপাশি ভারতীয় অভিজ্ঞতাকেও সংযোজিত করতে হবে যাতে দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে পাশ্চাত্যে ধর্ম যুক্তিবাদী দৃষ্টি পরিহার করেছে, এমনকি তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে—ফলে পাশ্চাত্য বাধ্য হয়েছে যুক্তিবাদী দৃষ্টি ও বিজ্ঞানকে একটা স্বতন্ত্র ধারা রূপে গড়ে তুলতে। এই ঘটনা ও তার ফলাফল এতটাই দুর্ভাগ্যজনক যে একটা অনিবার্য সংঘাত গড়ে উঠেছে বিজ্ঞান ও ধর্মের মাঝে এবং আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের কাছে ধর্ম তাই হয়ে পড়েছে অপ্রয়োজনীয় এবং অগ্রাহ্য।

এই পাশ্চাত্য প্রভাব যে মানসিকতা তৈরি করেছে সেখানে আধুনিক মানুষের বক্তব্য, 'আমরা ধর্ম চাই না, বিশ্বাসে আমাদের আস্থা নেই—যা কিছু করব তা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচার দিয়ে।' এই পাশ্চাত্য মানসিকতা সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করেছে আর এই দুর্ভাগ্যজনক প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশকেও প্রভাবিত করেছে কারণ পাশ্চাত্যকে আমরা উঁচু আসনে বসাতে অভ্যস্ত। তবে সৌভাগ্যের কথা, ইদানীংকালে পাশ্চাত্যও এই সংঘাতে আর সন্তুষ্ট নয়, সে খুঁজছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন এক উদার সমন্বয়।

৫ এই বিরোধ-সমাধানে আধুনিক পাশ্চাত্য-আকাঙ্ক্ষা

বিশ্বাস ও যুক্তির এই বিরোধ স্বল্পসময়ের জন্য ছাড়া পাশ্চাত্যের কোন উপকারই করে নি,—বরং পরিণামে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই পাশ্চাত্য নতুন করে এই সম্পর্ককে আরেকবার বিচার করে দেখতে চাইছে। তাই পাশ্চাত্যে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের প্রবক্তারা ক্রমশ তাঁদের ধর্মমতকে আর অন্ধ বিশ্বাস ও প্রচলিত প্রথার ওপর দাঁড় করাচ্ছেন না—খুঁজছেন পরীক্ষানির্ভর এক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি। আবার অন্যদিকে বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক পাশ্চাত্যে ঘোষণা করছেন, মানুষের একটা ধর্মবিশ্বাস প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, তাঁরা বলছেন, শুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চার চেয়েও বেশি প্রয়োজনীয় একটা উদার ধর্মবিশ্বাস যে বিশ্বাস যুক্তিবিচারের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। তাঁরা আরও জোর দিয়ে বলছেন, এই উদার ধর্মবিশ্বাস যদি যুক্তিবাদ বিচারের মধ্য দিয়ে গড়ে না ওঠে, তাহলে তা এক কুসংস্কার বা সস্তা যাদুবিদ্যায় পর্যবসিত হয়। তাকে প্রকৃত ধর্ম বলে না। কিন্তু পাশ্চাত্যের ইতিহাসে এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ধর্মকে দেখা হয় নি। তাই তারা ভারতীয় এবং অপরাপর প্রাচ্যদেশীয় ঐতিহ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছেন এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ। ক্রমশ পাশ্চাত্য দেশগুলি বুঝতে পারছে ভারতবর্ষের এই ধর্মসাধনা পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতা থেকে কতটা ভিন্ন। অথচ আমরা আমাদের দেশে এই অপূর্ব ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি কি, তা বোঝার চেষ্টা করি না।

ইতিহাসের যে আধুনিক পর্বের মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি তাকে এক কথায় বিজ্ঞানের যুগ বলা যেতে পারে, আর বিজ্ঞানচর্চাকে পরিচালনা করে যুক্তিবাদী চিন্তা এবং জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধানী এক দৃষ্টি। গত কয়েক শতাব্দী ধরে কিভাবে আধুনিক পাশ্চাত্যে এই চিন্তাধারা বিকাশ লাভ করল, তা আমাদের কাছে সত্যই আকর্ষণীয়। আমরাও আমাদের দেশে ঠিক এইরকম এক বিজ্ঞানচিন্তার বিকাশের মধ্য দিয়ে চলেছি। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত প্রত্যেকটি স্তরে প্রত্যেকটি

বালক-বালিকাকে আমাদের বিজ্ঞান শেখাতে হবে। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক প্রসারকে আমরা স্বাগত জানাই। এইসঙ্গে এ-কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যেই রয়েছে বিজ্ঞানচর্চাকে স্বাগত জানাবার প্রেরণা। পাশ্চাত্যের মতো এখানে সংঘাতের প্রয়োজন নেই, ধর্মকে দূরে সরাবার কথা তো ওঠেই না—কারণ আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য ভৌতবিজ্ঞানকে ভয় করে বসে নেই। বরং আমরা বিজ্ঞানচিন্তার মধ্যে এক মহত্ত্বের সন্ধান পেয়েছি। সে মহত্ত্ব কি? ধর্মের দৃষ্টিতে, আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের দৃষ্টিতে সে মহত্ত্ব আমরা দেখেছি মুক্ত, অনুসন্ধানী চিন্তার মধ্যে ও সত্যকে অকুতোভয়ে অনুসন্ধান করে যাওয়ার মধ্যে। মানুষের মন কত সুন্দর হয়ে উঠতে পারে এই সত্য অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার মধ্য দিয়ে!

৬ আধুনিক পাশ্চাত্যে পরিবর্তনের ইতিহাস—তর্কাতীত কর্তৃত্ব-নির্ভরতা থেকে যুক্তিবাদী অনুসন্ধানে

পঞ্চাশ শতক পর্যন্ত পাশ্চাত্য এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নি, বরং ধর্মীয় মতবাদের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে নিশ্চিন্ত ছিল। সামান্য কিছু হাল্কা যুক্তিবাদী কথাবার্তা বলত ঐ বিশ্বাসকে সমর্থন করে। এর ফলে একদিকে তৈরি হলো কুসংস্কার, অন্যদিকে শুরু হয়ে গেল ধর্মান্ধতা, উন্মত্ত হিংসা ও অত্যাচার। এর পরিবর্তন শুরু হলো পঞ্চদশ শতকের শেষ পাদ থেকে। মুক্ত অনুসন্ধান ও যুক্তিবাদী বিচারধারার এক মুক্ত বাতাস বইতে শুরু করল। সে বাতাস প্রথমে ছিল মৃদু, ক্রমশ বইতে লাগল প্রবলবেগে সমগ্র পাশ্চাত্যভূমিকে আলোড়িত করে—যার নাম আমরা দিয়েছি আধুনিক বিজ্ঞান ও তারই ফলাফলস্বরূপ আধুনিক শিল্প ও প্রযুক্তি। তৈরি হলো আধুনিক পৃথিবী। আর আমাদের দেশ? প্রায়

পাঁচ শতকেরও বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানচর্চাকে অবহেলা করে অজ্ঞান ও কুসংস্কারের অন্ধকার আমরা তৈরি করেছি। আজ তাকে অতিক্রম করে সময় হয়েছে নতুন করে বিজ্ঞানচিন্তার জগতে প্রবেশ করবার। আমাদের দেশের দীর্ঘ ইতিহাসে পাশ্চাত্যের ঐ অনুসন্ধানী স্বভাবটিকে আজ নতুন করে গ্রহণ করবার সময় হয়েছে। বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন তাঁরা কত ছোট ছোট কাহিনী দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন কিভাবে এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের স্বভাব সমগ্র পাশ্চাত্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

এরকম একটা কাহিনী আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, যখন প্রথম পড়েছিলাম। কাহিনীটি পঞ্চদশ শতকের কোন এক সময়ে কিছু পণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়ে। তাঁরা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে বসে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আলোচনা করছিলেন, ঘোড়ার কটা দাঁত। আলোচনা ও গবেষণার ধরনটাই ছিল অতীতের প্রতিষ্ঠিত কোন মতবাদ বা পুস্তক ধরে সত্যের অনুসন্ধান। কাজেই তাঁরা গাদা গাদা বই সংগ্রহ করে আনলেন ও খুঁজতে লাগলেন, এই লেখক কি বলেছে বা ঐ লেখক কি বলেছে। সেইসময় অ্যারিস্টটলের খুব নামডাক, তাঁর কথা ও চিন্তাকে যেহেতু শ্রদ্ধা করা হতো, তাঁর কথা উদ্ধৃত করে আলোচনা চলতে লাগল সোৎসাহে। ঠিক এইসময় এক তরুণ গবেষক নীরবে হল থেকে বেরিয়ে গেল। কেউ অত লক্ষ্য-ও করে নি। কিছুক্ষণ পরে সে যখন ফিরে এল, তখন সবাই তার দিকে লক্ষ্য না করে পারল না—কারণ এবার সে ফিরেছে একটা জ্যান্ত ঘোড়াকে সঙ্গে নিয়ে। ঘোড়াটাকে হলের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে সে সবাইকে বলল, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা জানতে চান ঘোড়ার কটি দাঁত? এজন্যে বইয়ের কি দরকার? এই তো একটা ঘোড়া, এর মুখটা হাঁ করে দেখে নিন, এর কটা দাঁত। তাহলেই তো প্রশ্নের সমাধান হয়ে যায়।'

আজকের দিনে এই তরুণ গবেষকের দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক ও

স্বাভাবিক-ই বলে আমাদের মনে হয়। কিন্তু সে যুগে এ ছিল একটা যুবকের অসঙ্গত শ্রদ্ধাহীন স্পর্ধা। সে কিনা অ্যারিস্টটল যা বলেছেন তা অস্বীকার করে বলে যে ঘোড়ার দাঁত আরও বেশি এবং আবার ঘোড়ার মুখগহ্বর পরীক্ষা করে তা দেখতেও বলে!

এই কাহিনীগুলো থেকে বোঝা যায় কেমন করে বিজ্ঞানচিন্তার মুক্ত বাতাস পাশ্চাত্যে বইতে শুরু করেছিল। ক্রমশ সেই মৃদুমন্দ বাতাস ঝোড়ো হাওয়ার মতো প্রথমে ইউরোপ, পরে সমগ্র পাশ্চত্য জগতকে অধিকার করে ফেলল। আর আজকের যুগে সেই বাতাস সমগ্র বিশ্বে প্রবাহিত। এর থেকে গড়ে উঠেছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মানসিকতা যা প্রশ্ন করে, অনুসন্ধান করে, পরীক্ষা করে দেখে প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ঘটনাকে—আর সে অনুসন্ধান মুক্ত, নিরপেক্ষ ও নির্ভীক। এই বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি—একে অধ্যয়ন কর, একে বিশ্লেষণ কর, প্রশ্ন কর, এর গতিপ্রকৃতিকে বুঝে নাও ও কিছু প্রাকৃতিক শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন কর—এই হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মূল নীতি। আধুনিক প্রাকৃতিক বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার নিয়ে—যা পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে, অর্জনযোগ্যতার মধ্য দিয়ে—আজ জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। এইখানেই আধুনিক ভৌতবিজ্ঞানের জয়যাত্রা, এইখানেই তার শক্তির পরিচয়, যা আধুনিক মানুষকে এত আকৃষ্ট করেছে।

৭ বিজ্ঞানের উৎস-সন্ধানে যেতে হবে আধুনিক ভারতকে, আর ফলে তুষ্ট থেকে নয়

আধুনিক ভারতবর্ষে আমাদের চাই এই বিজ্ঞানচর্চা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। এটা কখনই যথেষ্ট নয় যে আমরা শুধুমাত্র বিজ্ঞানের আধুনিক যত ফলাফল যেমন প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি, নানারকম কলাকৌশল ইতাদি—এরই পেছনে শক্তি ব্যয় করব। আমাদের অবশ্যই এগুলি প্রয়োজন, কিন্তু

আধুনিক বিজ্ঞানের এই ফলাফল নিয়েই যেন আমরা সন্তুষ্ট না থাকি। বিজ্ঞানচর্চার মূল শক্তির পেছনে অর্থাৎ শুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চা ও পদ্ধতির দিকে যেন আমাদের নজর থাকে। শুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণা পদার্থের সূক্ষ্মতম অস্তিত্ব ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশাল অস্তিত্ব এই উভয় দিকের রহস্য-সন্ধানে যে অগ্রগতি চালিয়েছে সেদিকে আমাদের দৃষ্টি থাকা দরকার। আধুনিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে পরিশীলিত বৈজ্ঞানিক মনের সামনে যে রহস্যের দ্বার উন্মোচিত হয়ে চলেছে তা আজ আমাদের সামনে নানাভাবে উপস্থিত।

একথা শুনলে আমাদের দেশের ছোট থেকে বড় সকলের মনে আনন্দের সঞ্চার হবে ও উৎসাহের বন্যা বইবে যে আমাদের দেশের সংস্কৃতিতেও বৈদিক যুগ থেকে এই যুক্তিবাদী বিচারধারাকে অনুসরণ করা হতো। উপনিষদে, বৌদ্ধশাস্ত্রে ও শাঙ্করভাষ্যে মানব ও বিশ্বপ্রকৃতিকে অনুসন্ধান করে চলা ও বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করার অজস্র উদাহরণ পড়ে রয়েছে। আর তার ফলেই এই দেশে একসময় প্রকৃতিবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিদ্যা উভয়ের দীপ্ত বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। ক্রমশ এই সত্য আমরা জানতে পারছি, প্রাচীন ভারত চিকিৎসাশাস্ত্র ও শল্যবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, ধাতুবিদ্যা, মহাকাশতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব, স্থপতিবিদ্যা ও পরিবেশবিজ্ঞানের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে কত উন্নতি লাভ করেছিল।

এই ঘটনার বিশেষ একটি প্রমাণ পাওয়া যায় পাণিনির অষ্ট্যাধ্যায়ী গ্রন্থে। গবেষকদের আধুনিক গবেষণা অনুযায়ী পাণিনি প্রায় চতুর্দশ খ্রীস্টপূর্বাব্দে (তারও আগেকার গবেষকদের মতে পঞ্চম খ্রীস্টপূর্বাব্দে) 'শলাতুর' শহরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শলাতুর কাবুল নদী ও সিন্ধুনদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। বর্তমানে এটি পশ্চিম পাকিস্তানের পাঠান-অধ্যুষিত অঞ্চলে। সংস্কৃত ভাষার যে কথিত রূপ বা লৌকিক রূপ, অন্যদিকে

ঐ ভাষা যেভাবে পবিত্র বেদাদিগ্রন্থে ব্যবহৃত, এই উভয় রূপকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে, তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাজিয়ে এবং নিজের পূর্বনির্ধারিত সূত্রগুলির সাহায্যে বিশ্লেষণ করে পাণিনি এক অপূর্ব ভাষাতত্ত্ব আবিষ্কার করলেন। এইসঙ্গে তিনি ধ্বনিতত্ত্ব ও ব্যাকরণকেও বিকশিত করলেন। মানবসভ্যতার ইতিহাসের সেই প্রাক্‌পর্ব থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন ভাষাকে এত গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয় নি, যা পাণিনি এবং তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পণ্ডিতেরা করেছেন সংস্কৃত ভাষা নিয়ে। তিনি প্রত্যেকটি স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ধ্বনিকে বিশ্লিষ্ট করলেন। এর ফলে সংস্কৃত একটি শ্রুতিমধুর ও ধ্বনিনির্ভর ভাষা হয়ে উঠতে পারল। তিনি ষোলটি স্বরবর্ণ ও পঁয়ত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণকে উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করলেন—যেমন 'অ'-কে প্রথমে বসালেন কণ্ঠ্যবর্ণ হিসেবে। এইসঙ্গে প্রকারভেদ করবার সময় সাহায্য নিলেন 'মাত্রা'র (অর্থাৎ কত সময় ধরে উচ্চারণযোগ্য), অভ্যন্তর-প্রযত্নের এবং বাহ্যিক-প্রযত্নের। সংস্কৃতভাষার প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত থিয়োডোর গোল্ডষ্টাকার একটি বই লিখেছিলেন গত শতাব্দীতে। তাতে তিনি লিখছেন ঃ (Panini ঃ His Place in Sanskrit Literature, 1st... Indian Edn, 1965, pp. 95-96)

'প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বড় শাখা দাঁড়িয়ে রয়েছে পাণিনির ব্যাকরণশাস্ত্রের ওপর নির্ভর করে। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানচিন্তার ইতিহাসে এত গভীর ও সুদূরপ্রসারী গবেষণা আর কোন ক্ষেত্রে বিশেষ দেখা যায় না। প্রত্যেকটি উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গির একটি সঠিক ও শুদ্ধ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ও সেইসঙ্গে বৈদিক ভাষ্যের ব্যাকরণগত ভিত্তি সুনিশ্চিত করা হয়েছে। প্রত্যেক বিজ্ঞানলেখক যখনই লেখবার সময় ভাষাসমস্যা নিয়ে অসুবিধেতে পড়েন তখনই এর সাহায্য নিয়ে থাকেন। হিন্দু (ভারতীয়) বিশ্বাসে যে আদিষ্ট পুরুষদের কথা বলা হয়, সেইসব

বিজ্ঞানমনস্ক প্রতিভাধর লেখকদের মধ্যে পাণিনিকে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বা প্রকৃত অর্থে ঋষি বলা যায়। এইরকম গবেষক ও লেখকের কাজের উৎসে এক দৈবী প্রেরণার সন্ধান মেলে।'

ডঃ ভি. এস. আগরওয়াল তাঁর 'India as known to Panini' গ্রন্থে বলছেন ঃ (p. 2-3)

'পাণিনি তাঁর সময়ের লোকমাধ্যম যে ভাষা তার প্রচলিত ও কথিত রূপবৈচিত্র্যের এক গভীর অনুসন্ধান চালিয়েছিলেন। একটি ব্যাকরণবিধি প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে তিনি তথ্যাদি সংগ্রহ করে সেই বিশেষ তথ্যগুলি থেকে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার করে যেতে লাগলেন। ভাষাতত্ত্বের ঘটনাগুলিকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্যভাবে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা নিয়ে তিনি তাঁর গবেষণার ব্যাপ্তিকে বিশালতর করে তুললেন, যাতে ভাষার প্রত্যেকটি ধরনের শব্দ ব্যাকরণের আওতায় আসে ঃ 'শব্দাযু বহবঃ সংকলিতাঃ, তান্ উপাদায় পাণিনিনা স্মৃতিরূপনিবদ্ধ' (কাশিকা—৪/১/১১৪)...।

'সামগ্রিক দৃষ্টিতে বলা যায়, পাণিনির ব্যাকরণ সংস্কৃত ভাষার মূল। এই মূলের সাহায্যে ভাষার বিকাশের প্রাণশক্তি আহৃত হয়েছে। তাই ইন্দো-ইউরোপীয়ান ভাষাতত্ত্বে পাণিনির অবদান এক কথায় অসামান্য। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ও ভারতের ইতিহাসে অষ্টাধ্যায়ী তাই নির্ভরযোগ্য তথ্যের একটি আকর হিসেবে পরিগণিত। সেই আলোতে বহু জ্ঞানবিজ্ঞানের ধারা আলোকিত—আমরাও আমাদের লেখায় সেই দিকগুলি তুলে ধরতে চাই।'

কত পরিশীলিত মন ও প্রতিভার ধারক ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষেরা। তাই শুধু ভৌতবিজ্ঞানে নয়, কাব্য, শিল্প, দর্শন ও ধর্মবিজ্ঞানেও তাঁদের প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট। তাঁরা 'সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্'-এর সাধনা করে গিয়েছিলেন ও বিশ্বকল্যাণের আকুতিকে হৃদয়ে ধারণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৮ অধ্যাত্ম-বিদ্যার ঐশ্বর্য

উপনিষদে যে দার্শনিক জ্ঞান ঋষিবৃন্দ পরিস্ফুট করে তুলেছিলেন সেই জ্ঞানই 'বেদান্ত' নামে পরিচিত। এই বেদান্তকেই তাঁরা ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্ম-বিদ্যা নামে আখ্যায়িত করেছেন। যেহেতু বিশ্বের এই পরিবর্তনশীল রূপবৈচিত্র্যের পেছনে এক অপরিবর্তনীয়, অদ্বৈত ও নিত্যশুদ্ধ চেতনসত্তার কথা এই বিদ্যাতে ব্যাখ্যাত হয়েছে, তাই এই বিদ্যাকে তাঁরা 'সর্ব-বিদ্যা-প্রতিষ্ঠা' বা সব বিদ্যার প্রতিষ্ঠাভূমি বলে নির্দেশ করেছেন। শঙ্করাচার্যের পরম গুরু অর্থাৎ তাঁর গুরুদেবের যিনি গুরু সেই মহা-দার্শনিক গৌড়পাদ এই ঐক্যদৃষ্টি বা ঐক্যজ্ঞানকে ঘোষণা করেছেন তাঁর 'মাণ্ডূক্যকারিকা' গ্রন্থে সপ্তম শতাব্দীর কোন এক সময়।

'অস্পর্শযোগো বৈ নাম সর্বসত্ত্বসুখো হিতঃ।
অবিবাদোঽবিরুদ্ধশ্চ দেশিতস্তং নমাম্যহম্ ॥' (৪/২)

—অজ্ঞান ও তার কার্যের সঙ্গে সম্বন্ধলেশশূন্য অদ্বৈত দর্শন নামে যে প্রসিদ্ধ অস্পর্শযোগ সকল প্রাণীর সুখ ও পরমকল্যাণস্বরূপ, যে যোগ সব রকম বিবাদ থেকে মুক্ত, পক্ষ-প্রতিপক্ষ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব থেকেও মুক্ত, সেই যোগকে আমি নমস্কার করি।

এই পরিশীলিত মনের একটি বহুমুখিনতা ছিল। এই মন সত্যের অনুসন্ধান করেছে বহির্জগতে, আবার অন্তর্জগতেও। সত্যের অনুসন্ধানকে কখনও সংকীর্ণ গণ্ডিতে এঁরা আবদ্ধ করেন নি—এমন কথা বলেন নি যে ভৌতবিজ্ঞানকে এগোতে হবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও যুক্তিবিচারের পথ ধরে, আর ধর্মচিন্তা এগোবে বিশ্বাসকে আশ্রয় করে। জ্ঞানার্জনের প্রত্যেকটি শাখায়, তা লৌকিক হোক বা আধ্যাত্মিক, এই ঋষিরা জোর দিয়েছিলেন জিজ্ঞাসার ওপর, অজানাকে জানার তীব্র আকুতি, সত্যকে অনুসন্ধানের তীব্র ব্যাকুলতার ওপর। এই ধরনের জিজ্ঞাসায় যুক্তিবিচারের পাশাপাশি

বিশ্বাসেরও একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান ছিল। কিন্তু এই বিশ্বাসের মানে এই ছিল না যে যা কিছু শুনবে সবই গিলে ফেলবে যুক্তিবিচার না করে। যুক্তিবিচারের পরিপূরক এক মূল্যবোধের মধ্যেই এই বিশ্বাসের মর্যাদা নিহিত।

৯ উপনিষদ্ ও ধর্মে নিহিত যুক্তিবাদ

আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছরেরও বেশি আগে উপনিষদের সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমরা মহান আধ্যাত্মিক আচার্যদের দেখা পেয়েছি যাঁরা প্রথম জীবনে ছিলেন ধর্মজগতের এক একজন বৈজ্ঞানিক গবেষক, পরবর্তী জীবনে তাঁদের উত্তরণ আচার্যপদে। তাঁরা কখনই ধর্মকে নির্বিচারে গ্রহণ করার বিষয়রূপে উপস্থাপন করেন নি, বরং আহ্বান করেছেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও অনুসন্ধানলব্ধ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ধর্মতত্ত্বকে গ্রহণ বা বর্জন করার জন্যে।

আমাদের উপনিষদে এই যুক্তিবাদী অনুসন্ধানের স্রোতটি যেন এক বন্যার আকার ধারণ করেছে, বিশেষত দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, যদিও প্রাক্-উপনিষদীয় যে বৈদিক সাহিত্য তাতে এই মেজাজটির উপস্থিতি নামমাত্র। উপনিষদের ঋষিবৃন্দ বিশ্বপ্রকৃতি, মানুষ এবং প্রচলিত ধর্মের দেবদেবীদের নিয়ে অত্যন্ত সাহসী সব প্রশ্ন তুলেছেন এবং যখনই সন্তোষজনক উত্তর পান নি, তখন সংশয় প্রকাশ করতে দ্বিধা করেন নি। ফলে তাঁরা একটা ধর্মবিজ্ঞান বিকশিত করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন, যে ধর্ম প্রকৃতিবিজ্ঞান বা ভৌতবিজ্ঞানের পরিপূরক, তার বিরোধী নয়। তাঁরা যে দর্শন বিকশিত করে তুললেন, সেই দর্শন ভৌতবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞানকে মিলিত করতে সমর্থ হয়েছে। সেই দর্শনই আমাদের কাছে বেদান্ত নামে পরিচিত। তাঁদের মতে সত্য এক, তাকে জানার দুই পথ, এক বহির্জগতের, অন্যটি অন্তর্জগতের। সত্যকে জানার,

অজানাকে জানার যে চ্যালেঞ্জ মানুষের মনে তা শুধুমাত্র বহির্বিশ্বে সীমাবদ্ধ নয়, মানুষের নিজের সত্তার গভীরেও তা পরিব্যাপ্ত। এই দুই জগৎ—বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ—এই উভয়কেই অনুসন্ধান করতে হবে—আর যুক্তিবিচার ও বিশ্বাস এই উভয়েরই প্রয়োজন হয় এই অনুসন্ধানের যাত্রাপথে। নিজেদের ওপর বিশ্বাস, অন্য মানুষের ওপর বিশ্বাস এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তিম পরিণামে বিশ্বাস—এ আমাদের প্রয়োজন। এই বহুমুখী বিশ্বাসকে বাদ দিয়ে সত্যের অনুসন্ধান অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় কারণ সত্যকে জানার চেষ্টা একটি একক প্রচেষ্টা নয়, বহু তত্ত্ব, বিশ্বাস ও ব্যক্তিত্বের এক সমবায়ী প্রচেষ্টা।

১০ সত্যানুসন্ধানে বিশ্বাস ও তার ভূমিকা

যে কোন যুক্তিসম্মত অনুসন্ধানের ভিত্তি বিশ্বাস। বিশ্বাস ছাড়া উচ্চস্তরের বিজ্ঞানচিন্তা বা উচ্চস্তরের অধ্যাত্মবিদ্যা, কোনটাই সম্ভব নয়। প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা আজ বলছেন যে বিজ্ঞান-গবেষণায় যুক্তিবিচারের পাশাপাশি চাই বিশ্বাস, যেমন আমাদের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ধর্মাচার্যদের মতে ধর্মের প্রয়োজন বিশ্বাসের পাশাপাশি যুক্তিবিচারের শক্তি। কিন্তু এই বিশ্বাস, এই 'শ্রদ্ধা' প্রচলিত যে গতিহীন জড়বৎ বিশ্বাস, যা নির্বিচারে কর্তৃত্বের ওপর নির্ভর করে বসে থাকে; প্রশ্ন করে না, পরীক্ষা করে দেখে না, তার থেকে একেবারেই ভিন্ন। শঙ্করাচার্য প্রকৃত 'শ্রদ্ধা'র রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থের এই অপূর্ব শ্লোকে।

'শাস্ত্রস্য গুরু-বাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যবধারণম্।
সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্‌ভির্যয়া বস্তূপলভ্যতে ॥' ২৫

—গুরুর উপদেশ ও শাস্ত্রের শিক্ষাকে যথার্থ সত্য বলে দৃঢ়তার সঙ্গে অন্তরে গ্রহণ করাকে জ্ঞানিগণ শ্রদ্ধা আখ্যা দিয়ে থাকেন। এই শ্রদ্ধার সহায়ে বস্তু অর্থাৎ সনাতন সত্য যে আত্মস্বরূপ তার উপলব্ধি হয়।

'সত্য-বুদ্ধ্যবধারণম্' বলা হয়েছে অর্থাৎ যে সত্য শিক্ষা দেওয়া হয়, তাকে যুক্তিবিচারের সাহায্যে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এরই নাম বিশ্বাস যার সাহায্যে সত্যকে অনুসন্ধান করা যায়। যে কোন নির্বোধ যা ইচ্ছা বিশ্বাস করতে পারে—কিন্তু সে বিশ্বাস সত্য কিনা পরীক্ষা করে না দেখে গ্রহণ করা চলে না। সেটাই প্রকৃত 'শ্রদ্ধা', যা বিশ্বাসকে যাচাই করে সত্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয় ও সাধককে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে উত্তীর্ণ করে। অনেক আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা একই কথা বলছেন, যেমন টমাস হাক্সলি। ডারউইনের সহযোগী এই গবেষকের একটি অবিস্মরণীয় উক্তির মধ্যে পাচ্ছি ঃ (Quoted by J. Arthur Thomson in his 'Introduction to Science', p. 22)

"যত দিন যাচ্ছে, তত আমার কাছে এটা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠছে যে মানুষের জীবনের সবচেয়ে পবিত্র কাজ হলো এই কথা বলা ও অনুভব করা— 'আমি এই বিষয়গুলিকে সত্য বলে বিশ্বাস করি'। ঐ কাজটিকে ঘিরেই আমাদের অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় পুরস্কার ও সবচেয়ে কঠিন শাস্তি।"

ধরা যাক, কেউ বলল যে অমুক মানুষ অসৎ। যাচাই না করে, সঠিক সংবাদ না নিয়ে কি আমরা বলতে পারি যে কথাটা ঠিক? আর তা না হলে, কথাটাকে একটা বিশ্বাসমাত্র, হয়তো 'মিথ্যা বিশ্বাস' বা কুসংস্কার বলা যেতে পারে। যে কোন নির্বোধ তো বলতেই পারে— 'আমি বিশ্বাস করি'। কিন্তু এর জন্যে চাই তীব্র মানসিক শৃঙ্খলাবোধ, যদি বলতে চাই— 'আমি বিশ্বাস করি যে এইগুলি সত্য'। প্রকৃতি বিজ্ঞানের যাত্রাপথে এরই নাম 'শ্রদ্ধা', অধ্যাত্মবিজ্ঞানেও একেই বলে 'শ্রদ্ধা'। শাস্ত্র এককথা বলে— তুমি বল যে তুমি বিশ্বাস কর। গুরু এককথা বলেন— তুমি বল যে তুমি বিশ্বাস কর। কিন্তু প্রশ্ন হলো—তুমি তোমার প্রাথমিক বিশ্বাসকে কি পরীক্ষা করে দেখেছ, যাচাই করে দেখেছ যাতে তুমি যা জেনেছ তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পার? একেই বলে 'শ্রদ্ধা'।

ধর্মজগতে এই অনুসন্ধান মানুষ চালায় নিজের জীবন দিয়ে, শুধু বুদ্ধির ব্যায়াম আর লক্ষহীন বাগ্‌বিতণ্ডা দিয়ে নয়। জীবনের চলার পথে এরকম কিছু প্রাথমিক বিশ্বাস প্রয়োজন, যেমন 'আমি এইগুলিকে সত্য বলে জানি'। এই বিশ্বাসগুলির মধ্যে একটা সৃজনশীল শক্তি কেন্দ্রায়িত হয়ে আছে—অন্যদিকে আবার কিছু বিশ্বাস থাকে যা মানুষের মনে স্থান নিয়ে রয়েছে গতিহীন, বিচারহীন এক আরামদায়ক অনুভূতির রূপ ধরে। প্রথমে যে বিশ্বাসের কথা বলা হলো, তা বিচারের মধ্য দিয়ে দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হয়, আর তাকেই বলে 'শ্রদ্ধা'। এই 'শ্রদ্ধা'-ই মানুষের মনুষ্যত্বের উপাদান, মানুষের অন্তরে কতটা 'শ্রদ্ধা' তার ফলেই তার মনুষ্যত্বের বিকাশ। *'শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ, স এব সঃ ॥'* (গীতা ১৭/৩)

১১ বিশ্বাস ও যুক্তি—একে অন্যের পরিপূরক

এই প্রসঙ্গে আপনারা 'শ্রদ্ধা' শব্দটির ভূমিকা লক্ষ্য করুন, সেটা মানবিক সম্পর্কগুলির ক্ষেত্রেই হোক, কিংবা বিজ্ঞানচিন্তার বা যুক্তিবাদী চিন্তার দৃষ্টিকোণ থেকেই হোক। সব রকমের বিজ্ঞানচর্চা বা ধর্মমতের বিচিত্র ধারা অথবা মনুষ্যজীবনের বিচিত্র গতিপ্রকৃতির যে কোন পথেই আমরা হাঁটতে থাকি না কেন, আমাদের প্রয়োজন 'শ্রদ্ধা'। প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই 'শ্রদ্ধা' বলতে কি বোঝায়? সেখানে 'শ্রদ্ধা' বলতে বোঝায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অর্থবোধের ওপর একটা বিশ্বাস। একজন বৈজ্ঞানিকের প্রাথমিক বিশ্বাস থাকে যে এই বিশ্বপ্রকৃতির বিশাল বিভ্রান্তিকর তথ্যসম্ভারের পেছনে একটা অর্থ নিহিত আছে আর সেইজন্যই প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনের এই প্রয়াস। এই বিশ্বাস না থাকলে একজন বৈজ্ঞানিক বিশ্বপ্রকৃতির অভ্যন্তরে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতেন না। এমনকি এই বিশ্বাস না থাকলে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার আগ্রহটুকুও অনুভব করতেন না। 'শ্রদ্ধা' এই আগ্রহ জাগিয়ে তোলে, যাকে শঙ্করাচার্য 'আস্তিক্যবুদ্ধি' আখ্যা

দিয়েছেন। অনুবাদ করলে আস্তিক্যবুদ্ধির সঠিক অর্থ দাঁড়ায় 'ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অভিমুখী যুক্তি বিচার'।

বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচারের দৃষ্টিতে 'বিশ্বাস'কে মর্যাদা দিয়ে তাই আর্থার এডিংটন লিখলেন : (The Philosophy of Physical Science, p. 222)

'এই যুক্তিবাদের যুগে 'বিশ্বাস'-এর মর্যাদা কিন্তু সবার ওপরে, কারণ—যুক্তিবিচার বিশ্বাসের-ই একটি উপাদান।'

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন বিজ্ঞান ও ধর্মের ওপর লিখতে গিয়ে লিখলেন : (Out of my later years. p. 26)

'ইদানীং যদিও ধর্ম ও বিজ্ঞানের নিজ নিজ পরিধি পরস্পর থেকে পরিষ্কারভাবে বিশ্লিষ্ট, তথাপি উভয়ের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক, একটা পারস্পরিক নির্ভরতার অস্তিত্ব আমরা লক্ষ্য করি। যদিও ধর্ম তা-ই, যা লক্ষ্যটিকে নির্দিষ্ট করে ; উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে দেখব কোন্ পথে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে ধর্ম তা শিখেছে বিজ্ঞানের কাছে। কিন্তু বিজ্ঞানের সৃষ্টি ও সম্ভাবনা একমাত্র সেইসব মানুষদের দ্বারাই সম্ভব যাঁরা সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষা ও উপলব্ধির দ্বারা অনুপ্রাণিত। এই অনুভূতির জগতের উৎস কিন্তু ধর্মে। এইসঙ্গে রয়েছে এই বিশ্বাস যে জড়জগতের নিয়ন্ত্রক সূত্রগুলি সম্ভবত যুক্তিগ্রাহ্য। আমি এরকম কোন সৎ বিজ্ঞানসাধকের কথা ভাবতে পারি না, যাঁর এরকম দৃঢ় বিশ্বাস নেই। সমগ্র বিষয়টি একটি ছোট্ট উপমা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়—ধর্ম বাদ দিয়ে বিজ্ঞান খঞ্জ আর বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে ধর্ম অন্ধ।'

যখন কঠোপনিষদ্ আমাদের সামনে সেই সত্য-সন্ধানী বালক নচিকেতাকে নিয়ে আসে, তখন নচিকেতার মধ্যে দেখি ঐ 'শ্রদ্ধা'র প্রকাশ (১/১/২) : *'শ্রদ্ধা আবিবেশ'*। 'শ্রদ্ধা'র প্রকৃত অর্থ কি? তার মানে কি এই যে তার বয়োজ্যেষ্ঠরা যতরকম আজগুবি গল্প তাকে শোনাবে, সবই

সে বিশ্বাস করবে? কখনই নয়। সে সত্যসন্ধানী, তার মধ্যে এই গভীর বিশ্বাস ছিল যে জীবন ও প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের পেছনে একটি সুগভীর সত্য বর্তমান। নচিকেতার এই মনকে একমাত্র তুলনা করা যায় একজন বৈজ্ঞানিকের মনের সঙ্গে, যিনি প্রকৃতির রহস্যের সম্মুখীন হন সত্যসন্ধানী গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে। এই ইতিবাচক দৃষ্টিরই আরেক নাম আস্তিক্যবুদ্ধি। এই আস্তিক্যবুদ্ধি এই বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যে জীবনতরঙ্গে সত্য কোথাও না কোথাও লুক্কায়িত—আমি সে বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত, আবার সে সত্যেরও আমি এক অনুসন্ধানী গবেষক। আমি সে সত্যের দেখা পাই নি কিন্তু আমি বিশ্বাস করি যে, সে সত্য বর্তমান। নচেৎ আমি কেনই বা আমার মূল্যবান যৌবনকে এই অক্লান্ত সত্যসন্ধানের পেছনে ব্যয় করব, যদি আমি জানি যে জীবনের কোথাও সেই সত্য লুকিয়ে নেই?

এই জানা পৃথিবীকে আমি দেখতে পাই, অনুভব করতে পারি আমার ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে ; কিন্তু যা অজানা তা আমার দৃষ্টির বাইরে, অনুভবের বাইরে—তবে আমি বিশ্বাস করি যে, তা সত্য। সত্যের এই অজানা দিকটির প্রতি যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তাকেই বলা যায় 'শ্রদ্ধা'। এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত কোন বিজ্ঞানচর্চা এগোতে পারে না, কোন বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে পারেন না, আবিষ্কার তো দূরের কথা। তাই বেদান্তে আমরা এই 'শ্রদ্ধা'র প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিই, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের অন্তর্নিহিত অর্থবোধের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিই এবং রহস্য উন্মোচনের যে মানবিক ক্ষমতা, লক্ষ্যে পৌঁছবার যে একনিষ্ঠ প্রয়াস তার ওপরও জোর দিই। এইগুলি অপরিহার্য।

'শ্রদ্ধা'র বিপরীত শব্দটি খুঁজলে আমরা 'শ্রদ্ধা' কথাটির প্রকৃত অর্থ ও তার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারব। কি সেই বিপরীত শব্দ? সংস্কৃত ভাষায় বলি—অশ্রদ্ধা, অর্থাৎ 'শ্রদ্ধা'র নেতিবাচক ইঙ্গিত। এই

অশ্রদ্ধা শব্দটি ইংরেজীতে একটি শক্তিশালী শব্দ দিয়ে ব্যক্ত করা যায়—Cynicism বা সবকিছুর প্রতি এক নেতিবাচক অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি। এই ধরনের মানুষের নিজের প্রতি বা চারিদিকের জগতের কোন কিছুর প্রতিই বিশ্বাস নেই; অশ্রদ্ধা এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এদের মন নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিপূর্ণ যেখানে শ্রদ্ধা বলতে বোঝায় ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি, শঙ্করাচার্য যাকে 'আস্তিক্য বুদ্ধি' নামে অভিহিত করেছেন। এই ইতিবাচক দৃষ্টি শিশুমনের সজীবতা ও অনুসন্ধিৎসারই যেন এক বহিঃপ্রকাশ, অন্যদিকে অশ্রদ্ধার মনোভাব বা নেতিবাচক দৃষ্টি পরাজিত ও জর্জরিত এক বৃদ্ধমনের যেন প্রতিফলন।

১২ যুক্তি ও বিশ্বাস বনাম অশ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি

অশ্রদ্ধা মানুষের সব মানবিক মূল্যবোধকে অবজ্ঞা করে ও তার আধ্যাত্মিক বিনাশ ডেকে আনে। পরিপূর্ণ জড়বাদকে আশ্রয় করে যে সভ্যতার বিকাশ তার সমুচিত প্রতিফল নেমে আসে অশ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে। অতীতে কখনও বেশি, কখনও কম এবং আধুনিক সভ্যতায় ক্রমাগতই আমরা দেখছি এই 'অশ্রদ্ধা'র প্রকাশ ও তার প্রভাব। এই অশ্রদ্ধা, সবকিছুর প্রতি এই নেতিবাচক অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি মানুষের মধ্যে খুঁটি গেড়ে বসে যখন মানুষ আধ্যাত্মিকতায় দুর্বল হয়ে পড়ে, জড়বস্তু ও ইন্দ্রিয়সুখের ওপর অত্যধিক নির্ভর করে বসে। সমস্ত মানুষের মধ্যে ও বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে এক সনাতন দৈবী স্ফুলিঙ্গ বর্তমান তাকে সে ক্রমশ অবজ্ঞা করে চলে। তখন জীবনের অভিজ্ঞতাগুলিকে আত্তীকরণ করে নেবার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা মানুষের থাকে না, বরং অভিজ্ঞতাগুলি তার সত্তা-হরণ করে নেয়। এর ফলে আসে 'অশ্রদ্ধা'। তখন 'শ্রদ্ধা'রূপ মূল্যবান রত্নটি সে হারিয়ে ফেলে, এবং তার বিপরীত 'অশ্রদ্ধা'-র সে শিকার হয়ে পড়ে।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখি কোনসময়ই এই আধুনিক যুগের মতো অশ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এত ব্যাপকভাবে সমাজে ছড়িয়ে পড়ে নি। প্রায় প্রত্যেক বুদ্ধিজীবী মানুষই যেন পুরোপুরি বা কিছুটা এই অশ্রদ্ধার ও অবজ্ঞার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বেঁচে আছেন। অতীতে জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে বিধ্বস্ত কোন কোন বৃদ্ধ মানুষের মধ্যে এই অশ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হতো। আর এখন এই মনোভাব শিশুদের মধ্যেও সংক্রামিত। কারণ, প্রকৃত বিজ্ঞান ও ধর্মের পেছনে, প্রকৃত জ্ঞান-অন্বেষণের পেছনে যে 'শ্রদ্ধা'র প্রয়োজন, সেই 'শ্রদ্ধা'র আজ একান্ত অভাব। প্রযুক্তি মানুষের ভোগবাসনাকে বাড়িয়ে তুলেছে মাত্রাজ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে, বুদ্ধি হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ ও চতুর। ফলে সে বুদ্ধি যে কোন বিশ্বাস, নিজের প্রতিই হোক বা অপরের প্রতি, তাকে নাড়িয়ে দিতে বা ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। কিন্তু এর ফলে আধুনিক মানুষ হারিয়ে ফেলছে তার সত্য অন্বেষণের স্পৃহা, তার সততা, তার সৌন্দর্যস্পৃহা, তার সুন্দরকে সৃষ্টি করার আন্তরিক আকুতি। অত্যধিক জানার একটা ভান করতে গিয়ে, জীবনের গভীর অর্থবোধের প্রতি বিশ্বাস হারাবার ফলে মানুষ তার জ্ঞানের উৎসগুলিকে শুষ্ক করে ফেলেছে। সত্যকে সন্ধান করে যাবার প্রয়াসকে বিসর্জন দিয়ে সে নিজেকে বদ্ধ করেছে ইন্দ্রিয়সুখ-নির্ভর জীবনে। ফলে জীবন পূর্ণ হয়ে গেছে বিরক্তি ও হতাশায়।

১৩ অশ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কুফল

কে যেন একজন, সম্ভবত অস্কার ওয়াইল্ড একটি বাক্যে একজন Cynic বা অশ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির মানুষকে চিনিয়ে দিয়েছেন। আমি সেটাই আপনাদের জানাচ্ছি—'এই চরিত্রের মানুষ এমন একজন যে প্রত্যেকটি বস্তুর মূল্য জানে কিন্তু কোন কিছুরই তাৎপর্য বোঝে না'। তার কাছে অনেক ব্যাপারের অনেক কিছু খবর আছে—কিন্তু কোন কিছুরই অন্তর্নিহিত

তাৎপর্য জানার চোখ তার নেই। কোন কিছুর প্রকৃত তাৎপর্য একটু গভীর দৃষ্টির সাহায্যেই অনুধাবন করা যায়। সেটা অনুভব করতে হলে চাই এক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। এরই ইঙ্গিত বহন করে 'শ্রদ্ধা' শব্দটি। একজন বৈজ্ঞানিক অশ্রদ্ধার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করেন না, তাঁর একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে। হয়তো জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর অশ্রদ্ধা থাকতে পারে, কিন্তু নিজের গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি কখনই ওরূপ নন। অশ্রদ্ধার দৃষ্টি সবকিছুকেই মূল্যহীন দেখে ও জীবন থেকে তার তাৎপর্য, তার প্রকৃত মূল্য সবকিছুই হরণ করে নেয়। এই দৃষ্টিতে মা জন্মদাত্রী একজন মহিলামাত্র, সেখানেই সব শেষ। এই অশ্রদ্ধাপূর্ণ মন সমস্ত অনুভূতি ও আবেগ দূরে সরিয়ে দেয় ও একটা উৎসাহহীন যুক্তি দিয়ে কোনরকমে চারিদিকের মানুয ও সবকিছুকে বিচার করে।

লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক তাঁর প্রখ্যাত 'গীতা-রহস্য' পুস্তকে এই অশ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে একজন মানুষ তার মাকে কি চোখে দেখে, সেটা বিবৃত করেছেন—*'গর্ভধারণ-প্রসবাদি-স্ত্রীত্ব-সামান্য-অবচ্ছেদক-অবছিন্ন-ব্যক্তি-বিশেষঃ'*—'সর্বসাধারণের মধ্যে স্ত্রীজাতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে বর্তমান এমন একজন ব্যক্তি যে গর্ভধারণ ও সন্তানপ্রসব ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত।' মায়ের এই যে একটা সংজ্ঞা পেলাম, এই সংজ্ঞাতে কোন মানুষ তার নিজের মাকে চিনতে পারবে না। কারণ, মাতৃত্বের সঙ্গে যে মূল্যবোধগুলি যুক্ত সেগুলি এই সংজ্ঞা থেকে বর্জিত হয়ে গেছে। কিন্তু অশ্রদ্ধাপূর্ণ মন এই দৃষ্টিতেই সবকিছুকে দেখে—মানুষ, জীবন, সবকিছু। এই দৃষ্টিভঙ্গি মাকে দেখে না, ওজন করে দেখে এই উৎপাদনশূন্য ব্যক্তিবিশেষটিকে সংরক্ষণ করে কতটা খরচ হয়? এই দৃষ্টিভঙ্গি কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ঘিরে যে মূল্যবোধ তা অনুধাবন করতে পারে না।

এইরকম সবকিছুর প্রতি উৎসাহহীন শুধু উপযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গি আজ লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রভাবিত করে চলেছে। এর কারণ বিশ্বাস থেকে

যে মূল্যবোধ জাগরিত হয় সেই মূল্যবোধ থেকে মানুষের বিযুক্তি, যুক্তিবিচার যা বাস্তব সত্যগুলিকে সামনে নিয়ে আসে তার থেকে মানুষের বিযুক্তি। ফলে বুদ্ধি ও বিচার নিষ্ফলা হয়ে পড়ে, মানুষকে সত্যের পথে ও পূর্ণতার পথে এগিয়ে দিতে হয় ব্যর্থ।

১৪ বেদান্তে ব্যাখ্যাত 'বুদ্ধি' এক সৃজনশীল বিশ্বাস ও যুক্তির সমন্বয়

মানুষের যুক্তিবিচার ও বোধশক্তি তখনই সৃজনশীল হয় যখনই তার সঙ্গে বিশ্বাস যুক্ত হয়। বেদান্তে এরই নাম 'বুদ্ধি'। 'বুদ্ধি' এখানে 'শ্রদ্ধা'র যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি যে সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি তার সঙ্গে মূল্যবোধের প্রতি মনের সংবেদনশীলতাকে ও বোধশক্তির বাস্তব ঘটনাবিশ্লেষণ ও ঘটনানিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাকে মিলিত করে, এবং সেইসঙ্গে ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতাকেও করে যুক্ত। বিশ্বাস, যুক্তি ও ইচ্ছাশক্তির এই এক অখণ্ড ঐক্যের নাম 'বুদ্ধি'। মানুষ এই 'বুদ্ধি'-কে বিকশিত করেছে তার প্রকৃতিদত্ত যে স্নায়ুতন্ত্র ও মানসিক গঠনের শক্তি তার সাহায্যে। এই শক্তিবলে বলীয়ান হয়ে সে শুধু প্রাকৃতিক অথবা আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারগুলি করে যাবার ক্ষমতাই অর্জন করে নি, সে নতুন শিল্পকলা উদ্ভাবনের পথে, ব্যষ্টি ও সমষ্টিজীবনের পূর্ণতার পথে নিজেকে বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছে।

কাজেই এটা স্বাভাবিক যে 'বুদ্ধি' শব্দটিকে আমাদের প্রচলিত বোধশক্তি কথাটি দিয়ে অর্থবোধ করলে খণ্ডিত অর্থই করা হবে। যুক্তিবিচার যখন গতিশীল, সৃজনশীল ও সমুজ্জ্বল এক মনোবৃত্তিরূপে উদ্ভাসিত হয়, তখনই বেদান্তমতে 'বুদ্ধি'র স্বরূপ প্রকাশিত। উপনিষদ্ ও গীতায় এই 'বুদ্ধি'র জয়গান গীত হয়েছে। গীতা মানুষকে এই 'বুদ্ধি'র শরণ নিয়েই জীবন পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে—'*বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ*'। (২/৪৯)

প্রচলিত অর্থের যে বুদ্ধিবিচার তা অত্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে মানুষের জীবন ও এই বাইরের পৃথিবীকে বিচার করতে গিয়ে তার কাব্যিক সৌন্দর্যকে নির্বাসিত করে ফেলে। সেই সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনে 'বুদ্ধি'। কঠোপনিষদ্ (৩/৯) মানুষকে তাই নির্দেশ দেয় জীবনের রথটিকে প্রকৃত সারথির দ্বারা পরিচালিত করতে। সে সারথি 'বিজ্ঞান' অর্থাৎ 'বুদ্ধি' বা 'জ্যোতির্দীপ্ত বিচারশীলতা'। পরিচালনা রথের ওপর ছেড়ে দিলে হবে না, যা তার শরীর—ঘোড়াগুলির ওপর ছেড়ে দিলে হবে না, যা তার ইন্দ্রিয়তন্ত্র—আবার লাগামের ওপর ছেড়ে দিলে হবে না, যা তার মানসিক গঠনতন্ত্র।

১৫ আধ্যাত্মিক জীবন যেখানে বিশ্বাস ও যুক্তির দ্বন্দ্বের অবসান

ভারতীয় দর্শনে যে উচ্চ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ সূচিত, সেখানে এই বিশ্বাস ও যুক্তিব দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে ওঠা সম্ভবপর হয়েছে। ভারতবর্ষেই এমন অনেক মানুষ আমরা দেখেছি যাঁরা যুক্তিবাদকেই একমাত্র আশ্রয় করে এগিয়ে গেছেন, আবার এমন মানুষও এসেছেন যাঁদের একমাত্র নির্ভরতা কোন আদর্শের প্রতি একাগ্রনিষ্ঠা বা 'শ্রদ্ধা'। উভয়েই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছেন নিজ নিজ গণ্ডির মধ্যেই উৎকর্ষসাধনের চেষ্টায়। বহু পণ্ডিত, বহু মেধাবী, যুক্তিবাদী বিচারে একেবারে সিদ্ধহস্ত, কিন্তু তাঁরা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন নিষ্ফল তর্কবিচারে, বিকৃত চিন্তাভাবনায়। মানবিকতার উষ্ণতাকে তাঁরা কুলোর বাতাস দিয়ে বিদায় দিয়েছেন, মানুষের সমগ্র জীবনের ওপর যে নিয়ন্ত্রণ আসে অনুভূতি, আবেগ ও যুক্তিবিচারের সংমিশ্রণে, সে নিয়ন্ত্রণকে তাঁরা দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।

অন্যদিকে আমরা এমন অনেক মানুষকে পেয়েছি যাঁরা আবেগে অনেক কিছু বিশ্বাস করেন কিন্তু ইচ্ছাশক্তিতে দুর্বল। কোন ঘটনাকেই সঠিকভাবে তাঁরা অনুধাবন করতে পারেন না, ফলে জন্মায় কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা।

কিন্তু আমাদের আচার্যবৃন্দ ও আমাদের নির্ভরযোগ্য শাস্ত্রাদি সবসময় জোর দিয়েছেন 'শ্রদ্ধা' ও 'যুক্তি', বিশ্বাস ও যুক্তিবিচার, এই উভয়ের এক সূক্ষ্ম ঐক্য গড়ে তোলার ওপর। এই ঐক্য থেকে আসে 'ধৃতি', যা একটা আধ্যাত্মিক জীবনাদর্শের যন্ত্রস্বরূপ। এই আধ্যাত্মিকতা অভিন্ন করে দেয় ঐহিকতা ও পবিত্রতা, কর্ম ও উপাসনা। উদ্দীপ্ত হয় 'বুদ্ধি' যাকে শঙ্করাচার্য *'নেদিষ্ঠম্ ব্রহ্ম'* বা 'ব্রহ্মের সন্নিকট' বলে অভিহিত করেছেন। মানুষ ও প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের অন্তর্নিহিত সত্য, মানুষের অন্তরের গুহায় নিহিত সত্য—তা-ই তো সর্বভূতান্তরাত্মা, তা-ই ব্রহ্ম। ইন্দ্রিয়নির্ভর যে জ্ঞান, বুদ্ধির নিষ্প্রভ আলো, তা দিয়ে সাধারণ বুদ্ধিবিচার চলে, কিন্তু 'বুদ্ধি' আলোচিত হয় 'একম্ জ্যোতিষাম্ জ্যোতিঃ' অর্থাৎ সব আলোর সারভূত এক আলো দিয়ে—আত্মা বা ব্রহ্ম বা শুদ্ধচেতনার আলো দিয়ে।

'গীতা'য় পূর্ণ যোগের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রচারিত তা এই জ্ঞান, ভক্তি, ধ্যান ও নিঃস্বার্থ কর্মের সমন্বয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। পরিশীলিত বুদ্ধির স্বচ্ছতা ও তথ্যাদির নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা, বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত হৃদয়বত্তার প্রাচুর্য এবং ইচ্ছাশক্তির তীব্র গতিশীলতা বুদ্ধিযোগের দ্বারা সমন্বিত। যুক্তিহীন 'শ্রদ্ধা' অন্ধ, আবার 'শ্রদ্ধা'-হীন যুক্তিবাদ শুষ্ক ও নিষ্ফলা। তাই 'গীতা' ও 'শ্রীমদ্‌ভাগবতম্'-এ ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়সাধনের ওপর এতটা জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষত, শ্রীমদ্‌ভাগবতে ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা বা ভক্তিকে সাধন করতে বলা হয়েছে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে—'জ্ঞান-বৈরাগ্য-যুক্ত্যা ভক্ত্যা'। ভাগবতের স্তুতি ও প্রশংসা করতে গিয়ে পদ্মপুরাণ তার 'ভাগবত-মাহাত্ম্য' অধ্যায়ে বিবৃত করছে ঃ (২/৭১)

'ইদং ভাগবতং নাম পুরাণম্ ব্রহ্ম সম্মিতম্।
ভক্তি-জ্ঞান-বিরাগাণাং স্থাপনায় প্রকাশিতম্ ॥'

—এই পুরাণকে 'ভাগবতম্' বলা হয়। এইটি বেদজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই এটি প্রকাশিত।

এখানে যে ভক্তির কথা বলা হয়েছে তা ঈশ্বরতত্ত্বের রহস্যভেদ করতে সমর্থ। এই ভক্তি, তার সাধন এবং অসংখ্য ভক্ত, সাধু ও অবতার পুরুষেরা কিভাবে তা প্রকাশ করেছেন নিজজীবনে, এই 'শ্রীমদ্ভাগবতম্'-এর মূল-তত্ত্ব—আর এই ভক্তি-ই হলো 'ভগবদ্গীতা'র সারবস্তু।

সুতরাং জ্ঞানের প্রয়োজন 'শ্রদ্ধা', 'শ্রদ্ধা'র প্রয়োজন জ্ঞান। এর ফলেই জ্ঞান প্রজ্ঞায় রূপান্তরিত হয়, নচেৎ জ্ঞান হয়ে উঠবে শুষ্ক বুদ্ধিচর্চা ও শ্রদ্ধা হয়ে দাঁড়াবে অন্ধবিশ্বাস ও সস্তা আবেগমাত্র। আমাদের মহান্ আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরুগণ এই একদেশদর্শী ভাবনার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক করে দেন।

যদি কোন মানুষ বলেন, 'আমি প্রেমের সংজ্ঞা জানি, আমি ঐ বিষয়ের ওপর বৃহৎ একটি গ্রন্থ রচনা করেছি ও ডক্টরেট পেয়েছি'—অথচ তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় 'আপনি কি প্রেম অনুভব করেছেন?' আর উত্তরে যদি তিনি বলেন, 'না'—তবে তাঁর ঐ বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার কি অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় না? প্রেমের জ্ঞানসমৃদ্ধ সংজ্ঞাগুলি জানার চেয়ে বরং প্রেমের যৎসামান্য অনুভূতিও অনেক ভাল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের তথ্যাদি ও ঘটনাবলী জানার বিষয়, কিন্তু মূল্যবোধগুলি অনুভূতির বিষয়। আবার অনুভূত হলে পর ঐ অনুভূত মূল্যবোধগুলিই ঘটনাবলী হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু তখন অবশ্যই তা গভীরতর অনুভূতি-রাজ্যের ঘটনা। এইজন্য জ্ঞান যখন বৌদ্ধিক স্তরের আহৃত তথ্যমাত্র, তখন তা শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারলেও খুব বেশি শ্রদ্ধা পায় না। এর পেছনে অপর একটি শক্তি থাকা প্রয়োজন, যেমন হৃদয়াবেগের অনুভূতি। তাই গীতায় কৃষ্ণ বলছেন (৪/৪০),

'অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'—শ্রদ্ধাবিরহিত সংশয়াকুল অজ্ঞ ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আবার বললেন (৪/৩৮), *'নহি জ্ঞানেন সদৃশম্'*—জ্ঞানের সদৃশ কিছু নেই। ঠিক তারপরেই কৃষ্ণ এই বলে আমাদের কাছে নিশ্চিত করছেন ঃ (৪/৩৯)

'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'—শ্রদ্ধাবান জ্ঞান লাভ করে—সেই জ্ঞান যা 'শ্রদ্ধা'র দ্বারা সমর্থিত ও সমৃদ্ধ—উজ্জ্বল ও উদ্ধারের আশ্বাসে শক্তিমান।

১৬ ভৌতবিজ্ঞানে কল্পনার অপরিহার্য ভূমিকা

ভৌতবিজ্ঞান ও তার গবেষণা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমি অবশ্য পূর্বেই বলেছি, যে বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির অভ্যন্তরে লুক্কায়িত সত্যকে জানতে চান তাঁর অবশ্যই এই বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন যে প্রকৃতির অভ্যন্তরে লুক্কায়িত সত্য বর্তমান। ঐ স্থির বিশ্বাসকে সম্বল করেই তিনি একজন প্রাকৃতিক সত্যসম্ভারের আবিষ্কারক হতে পারেন। নতুবা তিনি বিজ্ঞানশাস্ত্রের একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি হয়েই থাকবেন যিনি বিভিন্ন বিষয়ের নানা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করতে পারবেন যদিও নিজে একজন বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠতে পারবেন না।

শুদ্ধবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি উঠে আসে শুধুমাত্র স্বচ্ছ যুক্তিবিচার ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সাহায্যে নয়, বৈজ্ঞানিকের নিজের প্রতি ও প্রকৃতির সত্য পরিচয়ের প্রতি এক গভীর বিশ্বাসেরও সাহায্য নিয়ে। বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এই সত্য আমরা যত অনুভব করতে পারব, তত বুঝতে পারব কিভাবে বিজ্ঞান কলাবিদ্যা ও ধর্মবিজ্ঞান নামক দুটি সত্যান্বেষণের পথের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে রয়েছে। লক্ষণীয়, কলাবিদ্যা ও ধর্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুক্তিবিচারের চেয়ে কল্পনাজনিত বিশ্বাস কাজ করে বেশি।

কাজেই ভৌতবিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারের পথে বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের পাশাপাশি কল্পনাশক্তিও এক অপরিহার্য ভূমিকা গ্রহণ করে। কল্পনার

সাহায্যেই যুক্তিবিচার সৃজনশীল এক স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিতে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার, আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়াণ্টাম-তত্ত্বের যে আবিষ্কারে বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যা আলোড়িত, উদ্ভিদ ও প্রাণ, অপরদিকে জীব ও জড়ের অন্তর্নিহিত ঐক্য-প্রমাণের আবিষ্কারগুলি (বিশেষত স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর প্রয়াসের ফলে) ও এইরকম বহু আবিষ্কারের ঘটনা আমাদের দেখিয়ে দেয় কিভাবে এক সৃজনশীল কল্পনাশক্তি প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কাজ করেছে। এই সৃজনশীল কল্পনাশক্তি ও তার থেকে যে স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিগুলি উঠে আসে, সেগুলিই হলো 'শ্রদ্ধা' বা বিশ্বাসের মূল উপাদান। একটি আপেলকে পড়তে দেখে নিউটন এক আরোহ পদ্ধতিতে তাঁর কল্পনাশক্তিকে নিয়ে গেলেন মহাজাগতিক ক্ষেত্রে যেখানে একই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি চাঁদকে টেনে রাখছে পৃথিবীর দিকে, গ্রহনক্ষত্রকে গতিশীল করে তুলছে, এবং এমন এক বিশ্বব্যাপী শক্তির সন্ধান দিচ্ছে যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তু অপর বস্তুর ওপর প্রয়োগ করছে।

অনেক বৈজ্ঞানিক কল্পনাশক্তির এই প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন, ও এর থেকে যে স্বতঃলব্ধ জ্ঞান উঠে আসে তার গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের পথে এই স্বতঃলব্ধ জ্ঞান বা স্বজ্ঞা যুক্তিবিচারকে সাহায্য করে। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপক ফ্রিটজফ্ কাপ্রা তাঁর সদ্যপ্রকাশিত আকর্ষণীয় পুস্তকটি (The Tao of Physics)-তে এই প্রসঙ্গে লিখছেন : (p. 31)

'বৈজ্ঞানিক গবেষণার অধিকাংশ স্থানটি অধিকার করে রেখেছে নিরপেক্ষ বিচারধারা ও বিচারসিদ্ধ জ্ঞান, যদিও এগুলিই এই গবেষণার সব নয়। স্বতঃলব্ধ জ্ঞান বৈজ্ঞানিককে এক অন্তর্দৃষ্টির সন্ধান দেয় ও সৃজনশীল করে তোলে, কাজেই সেই স্বতঃলব্ধ জ্ঞানকে বাদ দিলে গবেষণার বিচারধারা তো অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এই অন্তর্দৃষ্টিগুলি গবেষকের

জীবনে আসে হঠাৎ। লক্ষণীয়, যখন তিনি টেবিলে বসে সমীকরণের সমাধান করছেন তখন নয়, বরং যখন তিনি বিশ্রাম করছেন, স্নানাগারে স্নান করছেন বা জঙ্গলে অথবা সমুদ্রসৈকতে বেড়াচ্ছেন তখন। একাগ্রচিত্তে যে বৌদ্ধিক ক্রিয়াকলাপ চলতে থাকে, তার পরে যে বিশ্রামের সময় তখনই এই স্বতঃলব্ধ জ্ঞান যেন মনকে অধিকার করে ও অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেয়। এই অন্তর্দৃষ্টি বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিয়ে আসে আনন্দ ও উল্লাস।'

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গুলি এই প্রকৃতির মাঝখানে জীবশরীরকে নানা বিচিত্র ও গতিময় ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রে পরিণত করেছে। কিন্তু সাধারণ জীবের ইন্দ্রিয়গুলির নিজেদের ক্ষেত্রে এই ক্রিয়াকলাপগুলির বেশিরভাগ পরস্পরের মধ্যে ঠিক সমন্বিত নয়, বরং স্বতঃস্ফূর্ত। শারীরিক অস্তিত্বরক্ষা ছাড়া যেন এদের আর কোন উপযোগিতা নেই। কিন্তু মানবশরীরে প্রকৃতি এই সমন্বয়কে সম্ভব করেছে মনের এক নতুন ভূমিকা সংযোজন করে, যাকে স্নায়ুতত্ত্ববিদ গ্রে ওয়াল্টার নাম দিয়েছেন 'কল্পনা' (The Living Brain, p. 2)।

ইন্দ্রিয় থেকে উদ্দীপনা জীবকে যে কোন কাজে প্রেরিত করে ; মানুষের ক্ষেত্রে তার আগেই সেখানে একটা ক্ষমতা কাজ করে যে ক্ষমতা উদ্দীপনাকে ধারণা করতে পারে ও অনেকগুলি বিকল্প ধারণা থেকে একটি নির্বাচন করতে পারে। গ্রে ওয়াল্টারের মতে এই নতুন ক্ষমতা উচ্চ প্রজাতির বানরদের মধ্যেও নেই। মানুষের আছে বলে মানুষ প্রকৃতির ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পেরেছে ও ক্রমবিকাশের এক নতুন ধারায় এগোতে পেরেছে। জীবশরীরের ক্রমবিকাশের ধারায় এটাকে একটা সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ বলা যেতে পারে। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওয়াল্টার রসিকতা করেছেন যে যদি কেউ মানুষের এই নবার্জিত ক্ষমতাকে বিশ্বাস না করে, তাহলে সে একবার ভেবে দেখুক না মানুষের

তুলনায় অন্য কোন জন্তুজানোয়ারের মধ্যে এই ক্ষমতার উদ্ভব ঘটলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে। ধরা যাক, বাঘ অথবা সিংহ বা অন্য কোন জন্তুর মধ্যে এই কল্পনাশক্তি বিকাশ লাভ করল। তখন আমরা মানুষেরাই হয়তো এই বিষয়টা আলোচনা করার জন্য এখানে উপস্থিত থাকতে পারব না!

প্রাচীন ভারতীয় দর্শন জ্ঞানকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করেছিল, অবচেতন ও অচেতন, স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি, ঐসঙ্গে সচেতন বা জাগ্রৎ অবস্থা এবং অতিচেতন বা সমাধি অবস্থা। এই চিন্তাধারার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় যুদ্ধোত্তর কালের মনস্তাত্ত্বিক গবেষণাপত্রগুলির মধ্যে। এই গবেষণাগুলিতে প্রাথমিক জ্ঞান যা অবচেতন বা প্রাক্-চেতন মনের কথা বলে (যেখানে কল্পনা যথেষ্ট প্রভাবশালী), দ্বিতীয়স্তরের জ্ঞান যা চেতন মনের কথা বলে (যেখানে বুদ্ধির প্রভাব যথেষ্ট বেশি), এ ছাড়াও তৃতীয় ধরনের জ্ঞানের কথা বলে যা প্রাথমিক জ্ঞানের সৃজনশীলতা ও স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে দ্বিতীয়স্তরের জ্ঞানের স্বচ্ছতা ও সূক্ষ্মতাকে সমন্বিত করতে পারে। চিন্তারাজ্যের এই আধুনিক বিকাশে আমরা আধুনিক মানুষের গভীরতর অনুভূতির সন্ধান পাই। ভারতীয় চিন্তায় বহুপূর্বে মানবমনের যে অসামান্য সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছিল, আধুনিক গবেষণায় সেই সম্ভাবনা স্বীকৃত। সসীম মন সসীম সত্যটুকু গ্রহণ করতে পারে। অসীম সত্যকে অনুভব করতে হলে প্রয়োজন অসীম মন। বেদান্তমতে মনকে শুদ্ধ করার অর্থ মনের ইন্দ্রিয়পরতার সীমা, অহংনির্ভর বিকৃতির সীমাকে অতিক্রম করা। শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে একটি গূঢ় সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন—শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি ও শুদ্ধ আত্মা একই, একই সত্য।

জানা থেকে অজানার পথে নতুন নতুন সত্য আবিষ্কার করার যে আরোহী পদ্ধতি, সে পদ্ধতিতে কল্পনাশক্তি সাহায্য করে বিচারশক্তিকে। একজন বৈজ্ঞানিক কিছু জ্ঞানসম্ভার নিয়ে শুরু করেন, বলেন—'আমি

এইটুকু জানি কিন্তু তার পরে আর কি আছে জানি না ; যদিও অনুভব করি তা আছে ; আমার কল্পনাশক্তি আমাকে বলে দেয়; আমি যা জানি তা পেরিয়ে রয়েছে গভীরতর সত্য, আর আমার কাজ সেই সত্যের অনুসন্ধান।' এই হলো 'শ্রদ্ধা' বা বিশ্বাসের মূল কথা, যা একটা সংশয়, একটা সৃজনশীল সংশয়কে ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে। ঠিক একই ভাবে যখন আমরা ধর্মজগতের প্রশ্নে আসি, তখন আমরা মনে করি, ইন্দ্রিয়গুলি যে নশ্বর জগতের ছবি আমাদের কাছে প্রকাশিত করছে তার পেছনে কোথায় এক শাশ্বত সত্য লুকিয়ে আছে। এই নশ্বর মানসিক তরঙ্গনিচয়—'আমি' 'আমি' করে যা ধরতে চাইছে—সেই অহংবোধের শাশ্বত গমনশীলতা, এ সবার পেছনে কোথায় এক গূঢ় সত্য লুকিয়ে আছে, যা রহস্যাবৃত। মানুষের অন্তরের গভীরে আমরা 'শ্রদ্ধা'র শক্তি নিয়ে খুঁজে চলেছি সেই সত্য। বহিঃপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে বিজ্ঞানীর যে প্রচেষ্টা, প্রত্যেক মানুষের রহস্য উন্মোচনের যে চেষ্টা ও আগেকার গবেষণাগুলির যে অভিজ্ঞতা, এ সবই মানুষের এই 'শ্রদ্ধা'-কে আরও গভীর, আরও শুদ্ধ করে তোলে। ধর্মজগতে 'শ্রদ্ধা'র পরিচয় এই নশ্বর, দৃষ্ট ও জ্ঞাত জগতের পেছনে অজ্ঞাত, অদৃষ্ট এক শাশ্বত সত্যের অস্তিত্বের প্রতি বিনম্র মনোভাবের মধ্যে। পঞ্চেন্দ্রিয় আমাদের সামনে যে সত্য নিয়ে আসে, তা যৎসামান্য, যদিও আকর্ষণীয়। যদি ইন্দ্রিয়সীমা অতিক্রম করতে পারি, তবে সেই শাশ্বত সত্যের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার আরও কত আকর্ষণীয়, আরও কত ফলপ্রসূ হয়ে উঠবে। সমস্ত আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি এই প্রাথমিক 'শ্রদ্ধা'র শক্তিতেই অগ্রসর হতে পারে। এই 'শ্রদ্ধা'র অন্যতম উপাদান সৃজনশীল সংশয়। অশ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও নিষ্ফল, সৃজনহীন এক সংশয় নিয়ে এগোলে এই ধরনের অনুসন্ধান ব্যর্থ হতে বাধ্য।

১৭ 'শ্রদ্ধৎস্ব, সোম্য'
(শ্রদ্ধাবান হও, সোম্য)

জানার পেছনে রহস্যাবৃত অজানার সম্মুখীন হতে প্রয়োজন সৃজনশীল 'বিশ্বাস' বা 'শ্রদ্ধা'। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই 'শ্রদ্ধা'র প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে একটি আকর্ষণীয় গল্পের মধ্য দিয়ে। বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক এই উভয় দৃষ্টিতেই আকর্ষণীয় এই গল্পে এক দীর্ঘ কথোপকথন আমাদের আকৃষ্ট করে যেখানে পিতা আরুণি আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান করছেন পুত্র শ্বেতকেতুকে।

উপনিষদ্ এই কথোপকথনের সূচনা করছে যেখানে দার্শনিক পিতা বার বছরের পুত্রকে গুরুগৃহে পাঠিয়েছিলেন শিক্ষালাভের জন্য। বার বছর গুরুকুলবাস শেষ করে পুত্র বাড়ি ফিরেছে। বাড়ি ফিরতে পিতা পুত্রকে প্রশ্ন করছেন শিক্ষার সম্প্রসারণ নিয়ে, যে কথোপকথন আজকের যুগেও শিক্ষাসম্প্রসারণে ও শিক্ষার পুনর্গঠনে সবিশেষ প্রয়োজনীয় ঃ (৬/১, ২-৩, ৪-৬ ও ৭)

'স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্বিংশতিবর্ষঃ সর্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধ এয়ায় তং হ পিতোবাচ শ্বেতকেতো যন্নু সোম্যেদং মহামনা অনূচানমানী স্তব্ধোঽস্যুত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ—॥ যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি ॥'

—বার বৎসর বয়সে গুরুগৃহে গিয়ে শ্বেতকেতু সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করে গম্ভীরচিত্ত, অভিমানী ও অবিনীত স্বভাব হয়ে চব্বিশ বৎসর বয়সে ফিরে এলেন। পিতা আরুণি তা লক্ষ্য করে বললেন, 'হে সোম্য শ্বেতকেতু, তুমি তো দেখছি গম্ভীরচিত্ত, অভিমানী ও অবিনীতস্বভাব হয়েছ—সেই আদেশটি জিজ্ঞাসা করেছিলে কি যার সাহায্যে অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় সুচিন্তিত হয় এবং অজ্ঞাতকে জ্ঞাত হওয়া যায়?' শ্বেতকেতু

বললেন, 'সে আদেশ আবার কিরূপ, হে পূজনীয়?'

'যথা সোম্যৈকেন মৃৎ পিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ...এবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি।'

—হে সোম্য, একটি মৃত্তিকাপিণ্ডের দ্বারা মৃত্তিকার পরিমাণভূত সমস্ত কিছু জানা যেতে পারে—কারণ সমস্ত বিকারই বাক্ অবলম্বনে নামমাত্র, কেবল মৃত্তিকাই সত্য ...এইরূপে ঐ উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে।

'ন বৈ নূনং ভগবন্তস্ত এতদ্‌বেদিষুর্যদ্ধ্যেতদবেদিষ্যন্ কথং মে নাবক্ষ্যন্নিতি ভগবাংস্ত্বেব মে তদ্ ব্রবীত্বিতি তথা সোম্যেতি হোবাচ ॥'

—শ্বেতকেতু 'পূজ্যপাদ গুরুগণ এটি অবশ্যই জানতেন না ; যদি তাঁরা জানতেন কেন তাঁরা বললেন না? যাই হোক, আপনি আমায় বলুন।' পিতা বলেন, 'হে সোম্য, তাই হোক।'

এই কথোপকথনের পরের দিকের অংশে উপনিষদ্ বলছে : (৬/১২, ১-২)

'ন্যগ্রোধফলমত আহরেতীদং ভগব ইতি ভিন্ধীতি ভিন্নং ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীত্যণ্ব্য ইবেমা ধানা ভগব ইত্যাসামঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি ভিন্না ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি ন কিঞ্চন ভগব ইতি ॥'

পিতা—এই সুবিশাল বটবৃক্ষ থেকে একটি বটফল আন।

শ্বেতকেতু—এই যে ভগবন্। পিতা—ভাঙ।

শ্বেতকেতু—ভাঙা হয়েছে, ভগবন্।—এতে কি দেখছ? —ভগবন্, অণুর মতো বীজসকল। —এদের একটিকে ভাঙ। —ভগবন্, ভাঙা হয়েছে। —এতে কি দেখছ? —কিছুই না, ভগবন্।

'তং হোবাচ যং বৈ সোম্যৈতমণিমানং না নিভালয়স এতস্য বৈ সোম্যৈষোঽণিম্ন এবং মহান্যগ্রোধস্তিষ্ঠতি শ্রদ্ধৎস্ব সোম্যেতি ॥'

পিতা তাঁকে বললেন, 'হে সোম্য, বীজের এই যে সূক্ষ্মাংশ যা দেখতে

পাচ্ছ না, সেই সূক্ষ্মাংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে এই মহা বটবৃক্ষটি বিদ্যমান হয়েছে। হে সোম্য, শ্রদ্ধা অবলম্বন কর।

অনুসন্ধানের বাধা অতিক্রম করে যাবার এই সংকটময় স্থানে গুরুর 'শ্রদ্ধৎস্ব' আদেশটির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে বলছেন :

'সতাঃ এব অণিম্নাঃ স্থূলং নাম-রূপাদি কার্যং জগৎ উৎপন্নম্ ইতি। যদ্যপি ন্যায়াগমাভ্যাং নির্দ্ধারিতোঽর্থঃ তথৈব ইতি অবগম্যতে, তথাপি অত্যন্ত সূক্ষ্মেষু অর্থেষু বাহ্যবিষয়াসক্তমনসঃ স্বভাব-প্রবৃত্তস্যাসত্যং গুরুতরায়াং শ্রদ্ধায়াং, দুরবগমত্বং, স্যাৎ, ইত্যাহ, শ্রদ্ধৎস্ব ইতি। শ্রদ্ধায়াং সত্যাং মনসঃ সমাধানং বুভুৎসিতে অর্থে ভবেৎ—ততশ্চ তদর্থাবগতিঃ—'

—এই যে পরমাণুসদৃশ অদৃষ্ট সদ্‌বস্তু অস্তিত্বরূপে বর্তমান, এর থেকেই নাম ও রূপকে আশ্রয় করে এই দৃষ্ট বহির্বিশ্ব প্রকাশিত। যদিও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবিচার ও শাস্ত্রজ্ঞান যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে সে সত্য সর্বজনগ্রাহ্য, কিন্তু যে সত্যজ্ঞান অত্যন্ত সূক্ষ্ম, গভীর বিশ্বাস ছাড়া সে সত্য ধারণা করা শক্ত, বিশেষত সেই ধরনের মনের কাছে যেসব মন বহির্জগতের বস্তুসম্ভারে ও প্রকৃতিদত্ত ভোগবৃত্তিতে আবদ্ধ। তাই গুরু উচ্চারণ করলেন, 'শ্রদ্ধা অবলম্বন কর'। যদি 'শ্রদ্ধা' থাকে, তবেই মনের পক্ষে ধীরস্বভাবে সত্যের অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া সম্ভব। এই সাধনাতেই অর্থবোধ সম্ভব।

ওপরের অনুচ্ছেদগুলি থেকে বোঝা যায় কিভাবে একজন ছাত্র আধুনিক পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রতত্ত্ব (Field Concept) ধারণায় আনতে অগ্রসর হবে। বস্তুকণাও এই ক্ষেত্র থেকেই উদ্ভুত হচ্ছে, ক্ষেত্রেই মিলিয়ে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্র অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত—কোন বস্তুরূপে চিহ্নিত না হলেও সবকিছুই।

অধ্যাপক কাপ্রার ভাষায় : (তদেব, পৃঃ ২২১-২৩)

'আধুনিক পদার্থবিদ্যায় ক্ষেত্রতত্ত্ব আমাদের বস্তুকণা ও শূন্যতার মধ্যে প্রচলিত যে পার্থক্যের ধারণা তাকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে। ...কোয়াণ্টাম ক্ষেত্রতত্ত্বে সমস্ত বস্তুকণা ও তাদের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মূল ভিত্তি হিসেবে এই ক্ষেত্রকেই ধরা হয়...। এই শূন্যতা অর্থহীন অসারতা নয়। বরং এই ক্ষেত্র অনন্ত বস্তুকণাকে ধারণ করে, যে ক্ষেত্রে বস্তুকণাগুলি মিশে যায় আবার যেখান থেকে উদ্ভূত হয়।

'আধুনিক পদার্থবিদ্যার এই ধারণা প্রাচ্যদেশীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানের (Mysticism) শূন্যতার ধারণার সমান্তরাল। প্রাচ্যদেশীয় যে শূন্যতার ধারণা, সেইকম ক্ষেত্রতত্ত্বে যে শূন্যতার কথা বলা হয়, সেটি কখনই কতকগুলি 'না'-এর সমষ্টি নয়। বরং এই ক্ষেত্র বিশ্বের সবরকম বস্তুকণার সম্ভাবনাকে ধারণ করে থাকে। এই বিশ্বের এই যে নানা রূপভেদ এগুলির স্বকীয় কোন বস্তুগত পরিচয় নেই, বরং এর প্রত্যেকটিই হলো সাধারণ ভূমি যে শূন্যতা তারই এক একটি ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ...। শূন্যতার যে একটি গতিশীল চরিত্র আছে, এই আবিষ্কারকে অনেক পদার্থবিদ্ আধুনিক পদার্থবিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলে মনে করেন।'

অপরিশীলিত মানবমন সাধারণত যা কিছু স্থূল, যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাকেই 'সৎ' বা সত্য বলে মনে করে। এই মানসিকতা যা সূক্ষ্ম, যা কিছু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য নয়, তাকে 'অসৎ' বা অসত্য বলে দূরে সরিয়ে দেয়। যা কিছু দৃষ্ট বস্তু তা যখন অদৃষ্ট হয়ে যায়, বাহ্যিক দৃষ্টিতে অসত্যে মিলিয়ে যায়, চিন্তারাজ্যের সেই খাড়াই রাস্তায় মানুষের অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে শক্তিশালী করতে হলে প্রয়োজন 'সত্যস্য সত্যম্' (সত্যের অন্তর্নিহিত সত্য) খুঁজে বের করবার অদম্য সাহস ও এক সৃজনশীল বিশ্বাস। ধর্মজগৎ, ভৌতবিজ্ঞানের জগৎ, কণাবিদ্যার জগৎ অথবা জীবনবিজ্ঞান, প্রজননবিদ্যা, জীবনের মূল উৎস-সন্ধান, তা RNA বা DNA যাতেই হোক না কেন, এ সব ক্ষেত্রেই এই 'শ্রদ্ধা', এই সাহসী চেতনা অপরিহার্য।

যা অন্তর্নিহিত সত্য তারই আলোকে প্রাকৃতিক, জৈবিক ও মানসিক প্রত্যেকটি শক্তিকে সত্য বলে চেনা যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই সত্যেরই প্রতিধ্বনি পাই ঃ (২/১-২০)

'স যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্ যথাঽগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্বে প্রাণাঃ সর্বে লোকাঃ সর্বে দেবাঃ সর্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি তস্যোপনিষৎ সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্ ॥'

—মাকড়সা যেমন নিজ শরীর থেকে উৎপন্ন তন্তু অবলম্বন করে বিচরণ করে, কিংবা অগ্নি থেকে যেমন ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গগুলি এদিক-ওদিকে বিকীর্ণ হয়, ঠিক তেমনি এই আত্মা থেকে সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত লোক, সমস্ত দেবতা, সকল প্রাণী নানাভাবে উৎপন্ন হয়। সেই আত্মার উপনিষৎ 'সত্যের সত্য'। ইন্দ্রিয়গুলি সত্য, ইনি তাদের সত্য।

ছান্দোগ্য উপনিষদে গুরুরূপী পিতার পুত্রকে শিক্ষাদানের পরের শ্লোকেই এই 'সত্যের সত্য' ও এর স্বরূপ ঘোষিত হয়েছে। এই 'সত্যের সত্য'-ই শুদ্ধ চেতনা, যা জীবাত্মা, আবার বিশ্বাত্মা-ও।

'স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো —' (৬/১৩/৩)

—এই পরমাণুসদৃশ সূক্ষ্মাংশ, এই প্রকাশিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এ সবের মূলে এই আত্মা। এই সত্য, এই আত্মা, হে শ্বেতকেতু, তুমি তাই।

১৮ যা সত্যবস্তু তাই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ

পদার্থবিদ্যার কণাবিশ্লেষণে পরমাণুর অভ্যন্তরে 'হ্যাড্রন' কণার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য শক্তির প্রবাহ দিয়েই ব্যাখ্যা করা হয়। সেই শক্তিপ্রবাহ থেকেই বিভিন্ন কণা উদ্ভূত হয়, আবার ঐ শক্তিপ্রবাহেই মিশে যায়। এই ঘটনাতে হ্যাড্রন কণার অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী। সে ঘটনার বৈশিষ্ট্য এক ধরনের

অনুনাদমাত্র (শব্দবিজ্ঞানে তীব্র কম্পনকে যে নামে বিশেষিত করা হয়)। এটিকে ঘটনাই বলা যায়, পদার্থ ঠিক বলা যায় না, যা হিন্দু (ভারতীয়) দার্শনিক ধারণারই এক প্রতিধ্বনি, যে ধারণায় 'স্ফোট' বা শব্দকে সৃষ্টিচক্রের মূলে কল্পনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আধুনিক পদার্থবিদ্যা চাইছে পদার্থের প্রকৃত রূপ খুঁজে বের করতে। পারমাণবিক স্তরের ওপরে আমরা পদার্থের পারমাণবিক ও আণবিক একটা গঠন নিয়ে নাড়াচাড়া করি এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিগুলি দিয়ে ব্যাখ্যা করি। কিন্তু পারমাণবিক স্তরের নিচে প্রত্যেকটি বস্তুকণা শক্তিতে রূপান্তরিত। সেগুলির ব্যাখ্যা একমাত্র আপেক্ষিকতা ও কোয়াণ্টাম-তত্ত্বের সাহায্যেই করা সম্ভব। স্যার জেমস্ জীনস্-এর ভাষায় প্রকৃতিকে তখন দেখতে হয় 'মানুষের স্বভাবগত চশমা সরিয়ে রেখে'।

শক্তির এক একটি বটিকা হলেও হ্যাড্রনকণা ও ঐ কণা-অনুনাদ আসলে পদার্থ। পদার্থের মূল খুঁজতে গিয়ে অনুসন্ধান অনেক দীর্ঘ পথ পার হয়ে এসেছে। প্রাচীন দার্শনিকদের পরমাণুর ধারণা (যা পরে অণু নামে আমাদের কাছে পরিচিত) থেকে পদার্থবিদ্যায় আবিষ্কৃত পরমাণুবিদ্যা ও সেই থেকে কণাতত্ত্ব ও কোয়াণ্টাম-ক্ষেত্র পার হয়ে বিংশ শতাব্দীর অনুনাদতত্ত্বে এসে আমরা উপস্থিত হয়েছি।

বেদান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমাদের বেশ কৌতূহল উদ্রেক করে যে কিছু কণা-পদার্থবিদ ইদানীং এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে পদার্থসৃষ্টির এই কণাগুলি কি সত্যিই গঠনহীন ও আদিকণা, না যে ভাবে কণাগুলি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে সেখানে আঁদৌ কোন আদিকণা আছে কিনা। অধ্যাপক কাপ্রার ভাষায় ঃ (তদেব, পৃঃ ২৭৩-৭৪)

'আমাদের জানা বস্তুকণাগুলির অবশ্যই একটা অন্তর্নিহিত গঠন আছে, এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে কারণ একমাত্র সেই ক্ষেত্রেই কণাগুলির সঙ্গে দ্রষ্টার একটা প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করা যায় ও কণাগুলিকে

সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যায়। এস্-ম্যাট্রিক্স (S-Matrix) তত্ত্বের প্রবক্তা জিওফ্রে চিউ-এর ভাষায়, "পদার্থের প্রকৃত আদিকণা যদি সম্পূর্ণ গঠনহীন হয় তবে তাকে এমন কোন শক্তির অধীনে আনা যায় না, যার দ্বারা এর অন্তর্নিহিত গঠনের একটা পরিমাপ করা যায়। তবে কণাটির অস্তিত্ব আছে এ তথ্য জানা থাকলে স্বভাবত এই সিদ্ধান্ত উঠে আসে যে নিশ্চয়ই এর একটা অন্তর্নিহিত কাঠামো বা গঠন আছে।" '

অধ্যাপক জিওফ্রে চিউ থেকে যে উদ্ধৃতি কাপ্রা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন, সেখানে বেদান্তদর্শনের একটা প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। বহুপূর্বে বেদান্ত আবিষ্কার করেছিল যে, পদার্থ ও শক্তি (এমনকি আধুনিক 'কোয়ার্ক' কে ধরে নিলেও) দেশ ও কাল, এমনকি দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে পদার্থের যে অবস্থান, এদের কারোরই এরকম বৈশিষ্ট্য নেই যে এরা গঠনহীন ও অবিভাজ্য। বেদান্তের পরিভাষায় এগুলি সবই 'দৃশ্যম্' বা জ্ঞানের বিষয়, এদের প্রত্যেকের অন্তর্নিহিত একটি গঠন আছে, এবং এরা 'অসৎ' বা মিথ্যা। কারণ এদের স্বভাব ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হচ্ছে—'প্রতিক্ষণম্ অন্যথা স্বভাবঃ' (শঙ্করাচার্য)। তাই বেদান্ত 'পরাবিদ্যা'র অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঐ নিরাকার ও অবিভাজ্য সত্য খুঁজে পেয়েছে 'দৃক্' বা জ্ঞাতার মধ্যে। আর এইগুলি? *'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্'* (ছান্দোগ্য)— বিভিন্ন নাম ও রূপের আশ্রয়ভূত চলমান বিভিন্ন বহিরাকৃতিমাত্র। বেদান্ত এই 'দৃক' বা জ্ঞাতাকে বলছে চিৎ বা শুদ্ধ চেতনা, এবং বস্তুজগতের বিচিত্র ঘটনাবলীর পেছনে কারণরূপে লক্ষ্য করেছে সব *'দৃক্'* ও সব *'দৃশ্যম্'*-এর একীকরণের ঘটনা। এই কারণেই প্রত্যেকটি অহংবোধ ও তার চেতনার বিচিত্র প্রকাশ আমরা জগৎ সংসারে দেখতে পাচ্ছি। বেদান্ত ঘোষণা করেছে, শুদ্ধ চিৎ অখণ্ড, অবিভাজ্য এবং সৃষ্টির আদি কারণ; এরই নাম দিয়েছে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ।

এই অবিভাজ্য *'সচ্চিদানন্দ' 'জ্যোতিষাম্ জ্যোতিঃ'*, 'সব জ্যোতির

জ্যোতি' ; বেদান্তের সাকার-নিরাকার ঈশ্বর, এর দর্শন, এর ধর্ম জ্ঞানমার্গী যুক্তিবিচার আশ্রয় করে এবং শাশ্বত ও নশ্বরের ভেদ নিরূপণ করে এই অখণ্ড 'সচ্চিদানন্দ'-এর নির্গুণ ও নিরাকার ভাবটি ধারণা করার ওপর জোর দেয়, অন্যদিকে ভক্ত, 'শ্রদ্ধা' ও 'ভক্তি' অনুসরণ করে সেই সত্যের সগুণ ও সাকার ভাবটির ওপর জোর দেয়। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, এই ভাবরূপটি হলো দৈবী চেতনাসমুদ্রে স্থানে স্থানে ভক্তি-প্রভাবিত এক একটি হিমায়িত আকার। বৈদান্তিক ভক্তিশাস্ত্রে ভক্ত হৃদয়ে পূর্ণবিকশিত পদ্মের ধ্যান করে। 'সচ্চিদানন্দ'-এর অনন্ত জ্যোতি থেকে যেন এই উজ্জ্বল, দৈবী ভাবসম্পন্ন পদ্মের বিকাশ, আবার ধ্যানের শেষে সেই জ্যোতিতেই পদ্মের বিলয়। *'একম্ সৎ, বিপ্রা বহুধা বদন্তি'*—'সত্য এক, ঋষিগণ তাকে ভিন্ন নামে অভিহিত করেন'—এই ঘোষণা উচ্চারিত হয়েছিল সুপ্রাচীন ঋগ্‌বেদে। আধুনিক যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'যত মত তত পথ'। এই যে এক দৈবী ঐক্যের ধারণা এর ফলেই বেদান্ত ভারতবর্ষকে শুধুমাত্র বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে নয়, এমনকি ধর্ম ও বিজ্ঞান, বিশ্বাস ও যুক্তি, ধর্মচিন্তা ও লৌকিকচিন্তা, ধর্মাচরণ ও লৌকিক ক্রিয়াকর্ম, এই সবগুলির মধ্যে এক সমন্বয়সাধনে ও পরস্পরকে উদারভাবে গ্রহণ করতে উৎসাহ দিয়ে এসেছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতম্ এই তত্ত্ব বা সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যকে, এই সর্বাবগাহী ঐক্যের ধারণাকে তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্লোকগুলির একটিতে ঘোষণা করেছে। লক্ষণীয়, এই সত্য কোন বিশেষ মতবাদ বা ব্যক্তিগত পছন্দ বা ব্যক্তিগত মতামত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

'বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।' (শ্রীমদ্‌ভাগবতম্, ১/২/১১)

—তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণ বলে থাকেন যে, অদ্বৈতজ্ঞানই তত্ত্ব। ঐ অদ্বৈতজ্ঞানই ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ভগবান নামে অভিহিত।

এই তত্ত্বের 'সৎ' ও 'চিৎ' দিকটির ওপর জোর দিয়ে থাকেন জ্ঞানী এবং ভক্ত এইটির সঙ্গে সঙ্গে 'আনন্দ'-এর ওপর জোর দেন। এই 'আনন্দ'-ই সব রকম শিল্পকর্মের প্রেরণা।

উপনিষদ্ ঐ 'অন্তিম সত্য'-এর নান্দনিক দিকটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে তৈত্তিরীয় উপনিষদে নিম্নলিখিত শ্লোকের মাধ্যমে ঃ (২/৭/১)

'রসো বৈ সঃ ; রসং হি এব অয়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি—'

—তিনি রসস্বরূপ, জীব জীবনে আনন্দের অনুভূতি লাভ করে ঐ রসের বিন্দুমাত্র আস্বাদনে।

'শুদ্ধ অদ্বৈতচেতনা'র স্বভাব 'গীতা' আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে, ঐসঙ্গে এই সত্য উন্মোচিত হয়েছে যে সব পদার্থ, সব শক্তি ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি চেতনার কেন্দ্র 'শুদ্ধ অদ্বৈতচেতনা'র এক একটি বহিরাকৃতিমাত্র। 'গীতা' থেকে এই প্রসঙ্গে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

'বহিরন্তশ্চ ভূতানামচর চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥' (১৩/১৬)

—ভূতগণের বাহির ও অন্তর, চলনশীল ও স্থির সর্বপ্রকার অস্তিত্ব, এই সবকিছুর অন্তরে অদ্বৈতচেতনা সূক্ষ্মরূপে বর্তমান—সাধারণ দৃষ্টিতে অবিজ্ঞেয়, দূরবর্তী, জ্ঞানিগণের নিকটবর্তী।

'অবিভক্তং ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥' (১৩/১৭)

—ভূতমধ্যে অবিভক্ত, অর্থাৎ কারণরূপে অভিন্ন অথচ বিভক্তের ন্যায় অর্থাৎ কার্যরূপে ভিন্ন—এইরূপে স্থিত, আবার ভূতগণের পালক, সৃষ্টিকারী ও লয়কারী।

'জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্ ॥' (১৩/১৮)

—এটি জ্যোতিষ্কগণের জ্যোতি অর্থাৎ তমসার ভেদকারী জ্যোতির প্রকাশক, প্রত্যেকের হৃদয়ে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্যরূপে অধিষ্ঠিত।

'সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎ স্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥' (১৩/২৮)

—তিনিই সঠিক দ্রষ্টা যিনি পরমেশ্বরকে সর্বত্র সমভাবে দর্শন করেন, নশ্বর বস্তুমধ্যেও সেই অবিনশ্বরকে ধারণা করতে পারেন।

'যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥' (১৩/৩১)

—যিনি ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ও জীবের মধ্যে এক চেতনা দর্শন করেন এবং সমগ্র অস্তিত্বকে সেই এক চেতনার বহিঃপ্রকাশরূপে দেখেন, তিনিই ব্রহ্মজ্ঞ।

পরমাণু-বিজ্ঞানী এরউইন স্রডিংগার তাঁর পুস্তক What is Life? (জীবন কি? পৃঃ ৯০-৯১)-এ একটি বৈদান্তিক সত্যের প্রতিধ্বনি করেছেন, যা আমরা উদ্ধৃত করছি। সেই সত্যটি হলো—'আত্মৈকত্ব-বিদ্যা প্রতিপত্তয়ে সর্বে বেদান্তাঃ আরভ্যন্তে' ঃ (ব্রহ্ম-সূত্রের শাঙ্কর ভাষ্য, সূত্র—৪)

অর্থাৎ—'বেদান্তের লক্ষ্য আত্মা ও শুদ্ধ চেতনার একীকরণ।'

'চেতনা কখনই বহুজনে মিলে অনুভূত হয় নি, অনুভূত হয়েছে ব্যক্তিহৃদয়ে ...। চেতনা একক অনুভূতির বিষয় যেখানে বহুবচন অজ্ঞাত। সদ্‌বস্তু একটিই, যা আমাদের কাছে নানা ও অনেকরকম মনে হয়, একটি সদ্‌বস্তুরই নানা প্রতিরূপের অনুক্রম। এই প্রতিরূপগুলি দৃষ্ট হয় ভ্রান্তিতে (ভারতীয় অধ্যাত্মবিজ্ঞানে যাকে "মায়া" বলা হয়েছে)।'

১৯ দৃগ্‌-দৃশ্য-বিবেক

কোয়াণ্টাম শক্তির ক্ষেত্র অথবা চতুর্মাত্রিক পরিমাপনে যে দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিত, এ সবগুলিই আধুনিক পদার্থবিদ্যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার ঊর্ধ্বে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অনুরূপভাবেই বেদান্তে চিত্তাকাশ, অর্থাৎ আকাশ বা শূন্যতা এবং চিত্ত বা মনোভূমির কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। একেই বলা যায় জ্ঞানের ক্ষেত্র অথবা চেতনার ক্ষেত্র যেখানে 'দৃক্‌' অর্থাৎ জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা এবং 'দৃশ্যম্‌' অর্থাৎ জ্ঞাত বা দৃষ্ট এই দুইটি মেরু বর্তমান। পরমাণুর অভ্যন্তরে পদার্থবিদ্যা যখন প্রবেশ করছে তখন একটা দ্বন্দ্ব, একটা বৈপরীত্য এসে পড়ে যখন 'দ্রষ্টা'-কে দেখা হয় গতানুগতিক পদার্থবিদ্যার তত্ত্বের আলোকে, অথচ 'দৃষ্ট'-কে দেখা হয় কোয়াণ্টাম-তত্ত্বের সম্ভাবনাগুলির দৃষ্টিতে। এই দ্বন্দ্বের সমাধান যখন করা হবে তখনই বৈদান্তিক সত্য আধুনিক পরমাণুবিদ্যার কাছে প্রতিভাত হবে। বেদান্ত 'মন' ও 'পদার্থ'-কে একই সত্যের সূক্ষ্ম ও স্থূল প্রকাশ বলে উল্লেখ করে। এই বৈদান্তিক সত্যকে পাশ্চাত্য এখনও পুরোপুরি গ্রহণ করে নি কারণ পূর্বে বা এখনো পাশ্চাত্য চিন্তারাজ্যে মন ও শরীরের দ্বন্দ্ব, মন ও পদার্থের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। কিন্তু যেহেতু মন পদার্থের সূক্ষ্ম এক প্রতিরূপ, মনকে পদার্থের মতো বা বাহ্যিক জগতের মতো স্থূলভাবে ধরাছোঁয়া যায় না।

এই 'চিত্ত' বা মন সম্বন্ধে প্রখ্যাত স্নায়ুতত্ত্ববিদ স্যার চার্লস সেরিংটনের মতামত আমরা লক্ষ্য করব কারণ এই মতামত স্নায়ুবিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা থেকে উদ্ভূত।

'এই (মন) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার দ্বারা গৃহীত না হয়েও বর্তমান এবং এভাবেই চিরকাল থাকবে।'

আবার সেরিংটন মন সম্পর্কে যা বলেছেন, প্রখ্যাত গাণিতিক ও পদার্থবিদ এডিংটন পদার্থ সম্পর্কে আধুনিক পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গিতে একই কথা বলেছেন।

'চেতনা প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয়—অন্য সব কিছুই পরোক্ষ বিচার বা অনুভূতির দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত।'

তা সত্ত্বেও চিত্তাকাশ 'দৃক্' বা জ্ঞাতা এবং 'দৃশ্যম্' বা জ্ঞাত এই দুইটি নিয়ে কিন্তু গঠিত, সুতরাং অবশ্যই গভীর অনুসন্ধানের বিষয়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান হয় চিদাকাশে, চিৎ বা শুদ্ধ চেতনায় যখন কার্যকারণ-বন্ধন পরিত্যাগ করে এই চিত্তাকাশই চিদাকাশে পরিবর্তিত হয়। বেদান্ত এই প্রকৃত 'দৃক্' বা দ্রষ্টা বা আত্মাকে অনুসন্ধান করা ও তাকে আবিষ্কার করাকে দুটি অপূর্ব শ্লোকের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছে ঃ ('দৃগ্-দৃশ্য-বিবেক'—দৃক্ ও দৃশ্যের প্রভেদ বিচার, শ্লোক ১ ও ৩০)

'রূপং দৃশ্যং লোকানাং দৃক্,
তৎ দৃশ্যং দৃক্ তু মানসম্।
দৃশ্যাঃ ধী-বৃত্তয়ঃ, সাক্ষী
দৃগেব, ন তু দৃশ্যতে ॥'

—যখন বহিরাকৃতি 'দৃশ্যম্' , তখন চক্ষু 'দৃক্' ; যখন চক্ষু 'দৃশ্যম্' তখন মন 'দৃক্', যখন মনের তরঙ্গগুলি 'দৃশ্যম্', তখন সাক্ষী জীবাত্মা 'দৃক্'। এই জীবাত্মা 'দৃশ্যম্' হতে পারে না।

'দেহাভিমানে গলিতে
বিজ্ঞাতে পরমাত্মনি।
যত্র যত্র মনো যাতি
তত্র তত্র সমাধয়ঃ ॥'

—যখন দেহাভিমান বিনষ্ট হয় ও পরমাত্মা অন্তরে অনুভূত হয়, তখন মন যেখানেই যায় সেখানেই সমাধি-অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে আদি কারণ সেই শুদ্ধ চেতনাকে বেদান্ত আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে। এর ফলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও জাগতিক

পদার্থসত্তার আমাদের চোখে বিনষ্ট হয় না, বরং প্রকৃত অর্থ নিয়ে আরও জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। ঠিক একই ভাবে আধুনিক কোয়াণ্টাম-তত্ত্ব ও পদার্থবিদ্যার আপেক্ষিকতাবাদ এই বাহ্য জগতকে শক্তির এক মহাসমুদ্র বলে উপস্থাপন করেছে, কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের জন্য এই বাইরের রূপবৈচিত্র্যকে উড়িয়ে দেয় নি। বরং এই কথা বলছে যে কোয়াণ্টাম-তত্ত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডের যে ছবি আমাদের সামনে নিয়ে আসছে, বাইরের এই আমাদের চেনাজানার জগৎ তারই একটা সীমাবদ্ধ রূপমাত্র। গতানুগতিক যে পদার্থবিদ্যার গবেষণা ও আবিষ্কার তা ঐ সীমাবদ্ধ রূপের মধ্যেই। বেদান্তমতে জ্ঞান কোন কিছু বিনষ্ট করে না, বরং তাকে জ্যোতির্ময় করে তোলে। পদার্থবিদ্যার গবেষণা অনেকসময় ভুল করে জড়বাদের গোঁড়ামিতে আটকে যায়। আমাদের চেনাজানার এই জগতের অনুসন্ধান করতে গিয়ে পদার্থবিদ্যা নিজেকে যদি এই ভুল থেকে মুক্ত করতে পারে, তবে এই জড়জগৎ-ই শুদ্ধ চেতনারূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হবে, এটাই বেদান্তের কথা।

টমাস হাক্সলি তাই বলছেন, 'ভৌতবিজ্ঞানের গবেষণায় জড়বাদ এক অনুপ্রবেশকারী, জড়পদার্থ প্রয়োজনীয় তত্ত্বরাজিমাত্র যার ভিত্তিতে গবেষণা অগ্রসর হয়।'

বহির্জগতকে আমরা দেখি, জানি কিন্তু অনুভব করি না—অন্যদিকে চেতনা আমরা অনুভব করি, যদিও তাকে দেখি না, জানিও না। দার্শনিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে বেদান্ত অনুভূতি ও জ্ঞানকে সংযুক্ত করে। এই সংযুক্তিরই অপর নাম প্রজ্ঞা, অনেক পাশ্চাত্য চিন্তানায়কেরা এই অভিযোগ করেন, বেদান্ত দর্শনশাস্ত্র নয়, ধর্ম। তাঁদের এ অভিযোগ এক দিক থেকে সত্য কারণ বেদান্ত ন্যায়শাস্ত্র-নির্ভর এক অনুমান-সাপেক্ষ দর্শন নয়। বেদান্ত জোর দেয় সত্যকে অনুভব করার ওপর। এর ফলেই এর রূপটা ধর্মসাধনার রূপ হয়ে দাঁড়ায়। 'জাগ্রৎ' অবস্থার অনুভূতি সাধারণত অনুমান-

সাপেক্ষ বিচারকে নিয়মিত করে। বেদান্ত এই দার্শনিক বিচারধারাকে সীমাবদ্ধ দৃষ্টি বলে মনে করে। এই বিচারে সত্যের অনাত্ম-রূপটি প্রতিভাত হয়। একে আশ্রয় করে পাশ্চাত্য দর্শন ও গতানুগতিক পদার্থবিদ্যার গবেষণা বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদদের গভীর গবেষণা ও বিংশ শতাব্দীর পদার্থবিদ্যা সত্যের সূক্ষ্ম রূপটিকে স্পর্শ করেছে—তা হলো আত্মস্বরূপ, যা স্বপ্নাবস্থার বিচার করতে গিয়ে প্রকাশিত হয়। 'দৃক্' ও 'দৃশ্যম্'-এর যে ঐক্য চিত্তভূমিতে ঘটে, তা প্রকাশিত হয় যখন আমরা স্বপ্নাবস্থা বিচার করি। সে বিচার স্বপ্নে থেকে হয় না, জাগ্রত অবস্থার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা আমাদের ঐ বিচার করতে শেখায়। আবার সুষুপ্তি অবস্থায়, সব 'দৃশ্যম্' এক শূন্যতায় অন্তর্হিত হয়ে যায়, ফিরে আসে জাগ্রৎ অবস্থায়। বেদান্ত ঐ শূন্যতাকে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় সব 'দৃশ্যম্'-এর সমন্বয় বলে মনে করে। এই আত্মার অনুভূতির অবস্থা, যাকে পরম সত্য বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। একে 'জাগ্রৎ' অবস্থার এক নতুন রূপ বলা যায়। এই ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থাকেই চতুর্থ অবস্থা বা তুরীয় অবস্থা বলা হয়।

এই পরম সত্যকে শুধু অনুমান নয়, অনুভব করতে হলে মানুষের প্রয়োজন পরিশুদ্ধ বিশ্বাসের ও স্বচ্ছ যুক্তিবিচার চালিয়ে যাবার শক্তি। অনুসন্ধানের গভীরে বিশ্বাস ও যুক্তি, শুদ্ধ ধর্ম ও শুদ্ধ বিজ্ঞান পাশাপাশি— এসে দাঁড়ায়। সত্যকে ধারণা করতে হলে ও জীবনকে সার্থক করে তুলতে হলে মানুষের এই উভয়কেই প্রয়োজন। অধ্যাপক কাপ্রার ভাষায় ঃ (তদেব, পৃঃ ৩০৬)

'নিরপেক্ষ বিচারসিদ্ধ মনকে আত্যন্তিক বিশেষীকরণের সাহায্যে আধুনিক পদার্থবিদ এই জগতের ধারণা নির্মাণ করেন। স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের উপলব্ধি হয় যে মনে সে মনের আত্যন্তিক বিশেষীকরণের সাহায্যে মরমী সাধকও এই জগতের এক ধারণা নির্মাণ করেন। এই দুইটি পথই সম্পূর্ণ আলাদা।

দুটি পথই বাহ্যিক জগতের কোন নিশ্চয়াত্মক দৃষ্টিতে আবদ্ধ থাকে না, বরং আরও এগিয়ে চলে। তবে এরা উভয়েই পরস্পরের পরিপূরক—ঠিক যেমন আমরা পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে অনেকসময় বলে থাকি। একটি দিয়ে অপরটির ধারণা হয় না, আবার একটি পথ অপর পথে পর্যবসিতও হয়ে যায় না। এই জগৎ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান আহরণ করতে হলে উভয়েরই পারস্পরিক পরিপূরণ প্রয়োজন। একটি প্রাচীন চীনা লোককথা থেকে ঠিক এই ভাবটি ফুটে উঠেছে নীচের উদ্ধৃতিতে—মরমী সাধকেরা 'তাও'-এর মূল চেনে, শাখাপ্রশাখা চেনে না ; বিজ্ঞানীরা শাখাপ্রশাখা চেনে, মূল চেনে না। বিজ্ঞানের মরমিয়া ভাবের দরকার হয় না, মরমিয়া ভাবেরও বিজ্ঞানের দরকার হয় না—কিন্তু মানুষের দুটোই দরকার।'

২০ 'আপ্তবাক্য' রূপে শ্রুতি

অদৃষ্ট বিষয়ের একটি মূল্য আছে বা তার একটি ফলোৎপাদন-ক্ষমতা আছে এই বিশ্বাস ধর্মজগতে আছে। এই পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের পরপারে যে পরমাত্মা বা জীবাত্মা বা ঈশ্বর, তার ধারণা করার মতো মনীষিগণ পূর্বকালে ছিলেন, এখনও আছেন, এই আবিষ্কার ধর্মজগতের।

নির্বিকল্পো হ্যয়ং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমোঽদ্বয়ঃ—

এই আত্মাকে সর্ববিধ বিকল্পরহিত দ্বৈত প্রপঞ্চ-বিবর্জিত অদ্বিতীয়রূপে উপলব্ধি করা হয়েছে। (মাণ্ডূক্য-কারিকা, ২/৩৫)

বেদান্ত ও বৌদ্ধধর্মের পরিভাষা অনুযায়ী যাঁরা এই সত্যকে ধারণা করতে সমর্থ হয়েছেন, তাঁদের 'লোকোত্তর' নামে অভিহিত করা হয়। কারণ, তাঁরা এই 'লোক' বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের আপেক্ষিকতা ও নশ্বরতার উর্ধ্বে উঠতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁদের অনুভূতির কথা সর্বসাধারণ জানতে পারে ভারতবর্ষে উপনিষদ্ এবং অন্যান্য দেশে এই ধরনের পুস্তক অধ্যয়ন করে।

সুতরাং কেউ যদি এই পথে অগ্রসর হয়, তার পেছনে প্রেরণার দুটি

উৎস আছে। এক, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একটা সাধারণ অর্থবোধ যে এই জৈবিক মানুষ ও তার চারপাশের এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পেছনে একটা অনাবিষ্কৃত শাশ্বত সত্য লুকিয়ে আছে। দুই, শত শত জ্ঞানী মানুষ যে 'লোকোত্তর' অনুভূতিলাভে সমর্থ হয়েছেন, যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতা, তাঁদের অন্তর্দৃষ্টি সমগ্র মানবসমাজকে পরিচালিত করতে পারবে। যে সত্যসন্ধ ও নির্ভরযোগ্য মনীষিগণ আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে গেছেন, তাঁদের অন্তর্দৃষ্টিতে কিছুটা আস্থা স্থাপন করে তবে একজন প্রবর্তক এই অচেনাকে আবিষ্কার করার পথে এগোতে পারেন। ঐ মনীষিগণ কখনই সবাইকে বলেন না তাঁদের অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে বা অন্ধভাবে অনুসরণ করতে। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে তাঁদের যে আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির কথা লেখা আছে, সেই আবিষ্কারগুলিকে তাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচাই করে নিতে বলেন। হিন্দু (ভারতীয়) ধ্যানধারণার বৈশিষ্ট্য এখানে। এখানেই 'শ্রুতি' বা উপনিষদের মহত্ত্ব।

মনীষিবৃন্দের কথা বা 'আপ্তবাক্য' এই অর্থে এত মহৎ, এত প্রয়োজনীয়। মানুষের পবিত্র ধর্মশাস্ত্রগুলির মূল্য কোথায় বা সীমাবদ্ধতা কোথায়, এ-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর একটি উপদেশপূর্ণ ক্ষুদ্র গল্পে বেশ মজা করে বলেছেন ঃ

'বেদ, বাইবেল, কোরাণ ও অন্য সব ধর্মশাস্ত্রে সত্য নেই বা ঈশ্বর নেই। মানুষকে সেই ধর্মশাস্ত্রের সংবাদগুলি কাজে লাগাতে হবে তার নিজের জন্যে যাতে সে সত্য বা ঈশ্বরকে জানতে পারে। পাঁজিতে প্রায়ই সারাবছরের বৃষ্টিপাতের ফলাফল লেখা থাকে, কিন্তু তুমি যদি পাঁজি নিংড়োও, এক ফোঁটা জলও পাবে না!'

ঠিক সেইভাবে শাস্ত্র নিংড়ে নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়, নিজের অনুভূতির গভীরে গিয়েই সত্য অথবা ঈশ্বরকে লাভ করা যাবে।

২১ শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত

আধ্যাত্মিক জীবনে 'শ্রদ্ধা'র স্থানটি নির্দেশ করার চেষ্টা করেছি। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে পূজক হিসেবে যখন শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক জীবনের সূচনা, দেখছি তখনই তিনি শুরু করেছেন তাঁর সংশয়, তাঁর জিজ্ঞাসা ঃ 'মা, সত্যিই কি তুই আছিস? শাস্ত্রে আছে সাধুরা বলে তুই নাকি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পশ্চাতে সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি ; আর আমি এখানে তোর পূজা করি মৃন্ময়ী মূর্তিতে, খুঁজে বেড়াই চিন্ময়ী মূর্তি। তুই কি সত্যিই আছিস? এই পরিবর্তনশীল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পেছনে সত্যিই কি তুই দৈবী অস্তিত্ব? তাহলে দয়া করে তুই আমার কাছে প্রকাশিত হ। আমি শুনেছি, তুই কবি সাধকদের যেমন রামপ্রসাদকে ও কমলাকান্তকে দেখা দিয়েছিস। যদি তাই হয়, তাহলে তুই আমার কাছেও প্রকাশিত হ। আমি তোর সন্তান, তুই ছাড়া আমায় পথ দেখাবার আর কেউ নেই রে, মা!'

এই সৃজনশীল 'শ্রদ্ধা'—কল্পনাশক্তি যেখানে স্বচ্ছ ও সহজ, সত্যানুসন্ধিৎসা যেখানে প্রবল, নিষ্ঠা সেখানে অক্লান্ত গতিশীল—সেই 'শ্রদ্ধা' আধুনিক জগতকে উপহার দিয়েছে এক অসাধারণ বৈজ্ঞানিক। ধর্মজগতের এই অসাধারণ বৈজ্ঞানিক হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মকে যেভাবে গ্রহণ করতে অগ্রসর হয়েছেন, এই পথই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য। উপনিষদের যুগ থেকে শুরু করে বুদ্ধের সময় অতিক্রম করে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে আমরা সংশয়াকুল এক উজ্জ্বল 'শ্রদ্ধা'র পাশাপাশি জিজ্ঞাসু মন ও যুক্তিশীল অনুসন্ধানের ভাবটি লক্ষ্য করেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের 'শ্রদ্ধা' সংশয়কে রুদ্ধ করে নি, বরং তীব্র করে তুলে তাকে এক সৃজনশীল রূপ দিয়েছে। ভৌতবিজ্ঞানের গবেষণাতেও সংশয়ের এই ভূমিকা, এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি কেন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য আধুনিক ভৌতবিজ্ঞানকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে ও তার সঙ্গে সম্পর্কটি সংরক্ষণ করেছে।

২২ 'বিশ্বাসের ইচ্ছে' বনাম 'অবিশ্বাসের ইচ্ছে'

'শ্রদ্ধা'র ভিত্তির ওপর যে সংশয় দাঁড়ায়, সে সংশয় সৃজনশীল, এই সংশয় স্বাস্থ্যকর চারিত্রগুণ, এই সংশয় প্রয়োজনীয়। কিন্তু শুধু সংশয়, তা-ও আবার অতিমাত্রায়, সে ভাল নয়। যদি অতিমাত্রায় বিশ্বাস করে বসে থাকা ভাল না হয়, অতিমাত্রায় সন্দেহ করা বা অবিশ্বাস করাও সমানভাবে খারাপ। যেমন আগেকার দিনের অনেক মানুষ বড় বেশি বিশ্বাস করে বসতেন, যা ঠিক সুস্থ মানসিকতার লক্ষণ নয়, ইদানীং অনেক মানুষের সব কিছুতেই অবিশ্বাস করার প্রবণতা, যাকেও ঠিক সুস্থ মানসিকতা বলা যাবে না। এই বিশ্বাসের আত্যন্তিক প্রবণতা থাকলে মানুষকে সহজে ঠকানো যায়, আবার অবিশ্বাসের প্রবণতা যখন একটা আত্যন্তিক রূপ নেয়, তখনই তাকে বলা যায় Cynicism বা অশ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। এ-সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এরকম অশ্রদ্ধাপূর্ণ মানুষকে যদি বলা যায় যে কোন ব্যক্তিবিশেষ সৎ, তবে সে সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ করে বলে, 'ওসব আমি বিশ্বাস করি না, ঢের মানুষ দেখেছি, অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি জানি, কেউ ব্যাটা সৎ নয়।' অবিশ্বাসের ইচ্ছে থেকে এই ধরনের অশ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও তার অত্যাচার আমাদের চোখে পড়ে। এই দৃষ্টিভঙ্গি আধ্যাত্মিক জীবনের মৃত্যুকেই ইঙ্গিত করে। এই ধরনের মানুষ ভৌতবিজ্ঞানী হতে পারে না, আবার আধ্যাত্মিক পথের সাধক বা শিক্ষকও হতে পারে না। এ এক মানসিক রোগ, যা কলেরা, জলবসন্ত, কুষ্ঠ বা ঐ জাতীয় মারাত্মক রোগ-ব্যাধির চেয়েও ভয়ঙ্কর। এই রোগে মানুষের ভেতরটা একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়; সৃজনশীলতা লোপ পায়। কোন নতুন সত্য এই ধরনের মানুষ আবিষ্কার করতে পারে না, কোন মূল্যবোধকে জীবনের অভিজ্ঞতায় সঞ্চয় করতে শেখে না। এমনকি সত্যকে জানার, অর্থ খুঁজে বের করার আবেগটুকুও এদের জীবনে রুদ্ধ হয়ে যায়। অথচ এই অনুসন্ধানের আবেগ, এই 'শ্রদ্ধা'র ভাব বিজ্ঞান

ও ধর্মের মূল বিষয়। স্যার আর্থার এডিংটনের মতে ঃ (Science & the Unseen World, p. 5)

'প্রকৃত বিজ্ঞান অথবা প্রকৃত ধর্ম, উভয়ের মূল সুরটি তুমি ধরতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমার মধ্যে অনুসন্ধানের স্পৃহা জাগরূক থাকছে।'

২৩ বিশ্বাস ও সেই বিখ্যাত ছিপ-ফেলার গল্প

এই সত্য এবং সেইসঙ্গে বিভিন্ন ধর্মমতে যে ধ্যানযোগের কথা বলা হয়েছে, সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি সুন্দর গল্প বলেছিলেন। যখন মাছ ধরতে চাই, তখন আমরা কি করি? ছিপ আর সুতো নিই, বঁড়শিতে টোপ লাগিয়ে নিই, পুকুরের ধারে গিয়ে বসি ও ছিপ ফেলি। তারপর—চুপ করে বসে লক্ষ্য করি। আমরা হয়তো ঐ পুকুরে মাছ দেখি নি, কিন্তু এই বিশ্বাস আমাদের আছে যে পুকুরে মাছ আছে কারণ শুনেছি যে আজও অনেকে ঐ পুকুরে মাছ ধরেছে। অনেকসময় দীর্ঘ সময় ধরে হয়তো বসে থাকতে হয়। দু-এক ঘণ্টা বসে থেকে যদি মাছ না পাই, তাহলে এ সিদ্ধান্ত করে বসি না যে, পুকুরে মাছ নেই। উপনিষদের সেই 'শ্রদ্ধৎস্ব, সোম্য' উপদেশটি স্মরণ করব ও পরের দিন, দরকার হলে তার পরের দিন আবার মাছ ধরতে আসব। মাছ না পেলেও আমাদের চেষ্টা চলবে। এই একাগ্র প্রয়াসের পেছনের প্রেরণাটা কি? প্রেরণা হলো এক মূল বিশ্বাস যে, পুকুরে মাছ আছে; এই বিশ্বাস আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এই জ্ঞানলাভ করে যে অন্য অনেকে আমার আগে এসেছে ও এই পুকুরে মাছ পেয়েছে। তার মানে, পুকুরে মাছ আছে যদিও আমরা নিজেরা তা আবিষ্কার করতে এখনও সমর্থ হই নি। যদি অধ্যবসায়ের সঙ্গে চেষ্টা চালিয়ে যাই, তাহলে আমরাও সফলতা লাভ করব। এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর ফলস্বরূপ যে এক কর্মপ্রেরণা, এইগুলিই ভৌতবিজ্ঞান ও ধর্মজগতের যে কোন সভ্য

আবিষ্কারের পেছনে কাজ করে।

উপনিষদের ঋষিবৃন্দ এই শ্রেণীতেই পড়েন। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, তাঁরা জীবাত্মায় বা ঈশ্বরে পরম সত্য অনুসন্ধানের কাজে যুক্ত থেকেছেন। সাধারণ মানুষের কাছে অনতিক্রমণীয় যে সব বাধা, তাঁরা সেইসব বাধার মুখোমুখি হয়েছেন। নিজেদের—ইন্দ্রিয়বাসনা সংযত করেছেন, মনকে শান্ত করেছেন এবং এই সমস্ত শক্তিকে একাগ্র করেছেন। তারপর তাঁরা সেই শক্তির সহায়ে অন্তর্জগতের গভীরে প্রবেশ করেছেন ও আবিষ্কার করেছেন সেই সর্বজনীন আধ্যাত্মিক সত্য যা বেদান্ত ও বৌদ্ধধর্মের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে এসেছিল। এই আবিষ্কার তাঁদের, সেইসঙ্গে সমস্ত মানবজাতির আনন্দ ও কল্যাণের পথ প্রশস্ত করেছে।

আবার শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ গল্পেই ফিরি। ছিপ ফেলে অনেকক্ষণ বসার পর দেখি, ফাতনা কাঁপছে। এই যা দেখা যাচ্ছে, তার থেকে জলের তলায় কি ঘটছে তার একটা খবর আমরা পাই, অর্থাৎ একটা মাছ টোপে ঠোক্কর দিচ্ছে, মাছটা হয়তো চলে যায়; আমরা আবার বসে থাকি ও ফাতনার দিকে তাকিয়ে থাকি—কিন্তু আমাদের প্রথম দিককার 'শ্রদ্ধা' এখন বহুগুণ বেড়ে গেছে। এর পর যখন দেখি ফাতনা কাঁপছে, ছিপেও টান পড়ছে তখন বুঝতে পারি—একটা বড় মাছ টোপটা গিলেছে। তখন ছিপে টান দিই আর মাছ উঠে আসে। আধ্যাত্মিক সাধনায় বঁড়শি আমাদের মন আর টোপ হলো ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও চরিত্রের শুদ্ধতা। ঈশ্বর অনুসন্ধানে যদি আমাদের নিষ্ঠা অটল থাকে, তবেই তাঁকে পাব।

আদিযুগের সেই অগ্রগামী মহাঋষিদের তপস্যা মানবসমাজকে অধ্যাত্মবিজ্ঞান-স্বরূপ সুমিষ্ট ফল উপহার দিয়েছে। কঠোপনিষদে গুরুরূপী যম শিষ্য নচিকেতাকে এই সাধনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করছেন নিম্নলিখিত শ্লোকের মাধ্যমে : (২/১/১)

'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥'

—স্বয়ম্ভূ পরমেশ্বর জীবের ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্মুখ করে বিনাশ করে দিয়েছেন। তাই জীব বহির্বিষয়গুলিই দেখে, অন্তরাত্মাকে নয়। কোনও বিবেকী অমৃতত্বের অভিলাষী হয়ে ইন্দ্রিয়সমূহকে অন্তর্মুখী করে প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন।

২৪ বিশ্বাস ও অধ্যবসায়

ভৌতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সত্যের অনুসন্ধান চলতে থাকে, সেই অনুসন্ধানও এই ধরনের বৈপরীত্যের সঙ্গে লড়াই, বিফলতা, হতাশা ইত্যাদি অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়। সেখানেও সফলতা পেতে গেলে প্রয়োজন হয় ঐরকম সাহস ও অধ্যবসায়। একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পেছনে অনেক ব্যর্থতা, অনেক হতাশা লুকিয়ে আছে এটা যেন আমরা ভুলে না যাই। বৈজ্ঞানিক মাদাম কুরীর কথাই ধরা যাক। তিনি রেডিয়াম মৌল আবিষ্কার করেন ও তাকে বিশ্লিষ্ট করতে সক্ষম হন। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের পেছনে ছিল বহু বছরের গবেষণা। পিচ্ব্লেণ্ড নিয়ে একটা ঠোট্ট স্যাঁতসেতে ঘরে এই গবেষণা কত বিফলতার মধ্য দিয়ে এগিয়েছে দিনের পর দিন। এই সাধনার ভাবটিকে ভারতবর্ষ 'তপস্যা' নাম দিয়েছে। সত্যানুসন্ধানের এই দুশ্চর তপস্যায় তিনি সাহায্য ও উৎসাহ পেয়েছেন তাঁর মহৎ বৈজ্ঞানিক স্বামীর কাছ থেকে। সত্যসন্ধানের এই দৃষ্টিভঙ্গি, এই তপস্যা, এই সাধনা ভৌতবিজ্ঞান ও ধর্মবিজ্ঞান, উভয় জগতেই বিদ্যমান ও পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কিত। 'মাণ্ডুক্য-কারিকা'য় মহর্ষি গৌড়পাদ তপস্যার এই অদম্য অধ্যবসায়ের দিকটি তুলে ধরেছেন নিম্নলিখিত শ্লোকে ঃ (৩/৪১)

'উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা।
মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ভবেদ্ অপরিখেদতঃ ॥'

—কুশের অগ্রভাগ দিয়ে এক এক বিন্দু করে সমুদ্রশোষণের ভাবটি যেরূপ, উদ্যমশীল অনবসন্নচিত্ত ব্যক্তির মনোনিগ্রহ ঠিক সেইরূপ।

অধ্যবসায় সহকারে সত্যের অনুসন্ধান, এই ভাবটি কাজ করে শুদ্ধ বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়েরই চর্চায়, পার্থক্য শুধুমাত্র উভয়ের অনুসন্ধান-ক্ষেত্রে। এই বহির্জগতে ভৌতবিজ্ঞানী সত্যের সন্ধান করে চলেছেন পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ও পঞ্চেন্দ্রিয় ব্যবহার করতে পারে এরকম যন্ত্রের সাহায্যে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানীর অনুসন্ধান পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতকে অতিক্রম করে, যেখানে বাগিন্দ্রিয়, এমনকি (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-তথ্যাদি নির্ভর) মনও পৌঁছতে পারে না—'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ' (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২/৯)। এখানে চলে ঈশ্বরের সন্ধান ও আত্ম-সাক্ষাৎকার। দীর্ঘকাল যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তত্ত্ব যাচাই করে নেওয়ার ইতিহাস চলে এসেছে উপনিষদ্ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত, সেই ঐতিহ্যই ভারতবর্ষের পরম উপহার, শ্রেষ্ঠ ইচ্ছাপত্র।

২৫ বিজ্ঞান ও ধর্মে সত্যানুসন্ধানের তপস্যা

তাই ভারতবর্ষের ধর্মজগতে কোন এক মতবাদ বা কোন এক তত্ত্বে বিশ্বাস করে থাকাটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হলো সেটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যাওয়া ও আত্মা সম্বন্ধে, ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্যকে ধারণা করতে পারা। বিশ্বাস করাটা কিছু নয়। প্রথমের দিকে এই কথাই বলেছিলাম ; যে কোন নির্বোধ বলতে পারে, 'আমি বিশ্বাস করি' ; পুরুষই হোক আর নারীই হোক সে বিশ্বাস করে, তা সত্ত্বেও একটা বদ্ধ, নিস্তেজ মানসিকতা নিয়ে কাটিয়ে দেয় বছরের পর বছর। ঐ বিশ্বাস তার চরিত্রে বা মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্কে কোন পরিবর্তন আনে না।

কিন্তু যে মানুষ ধর্মবিজ্ঞানকে জীবনে গ্রহণ করেছে, সেই মানুষ কখনই এরকম আরামদায়ক নিশ্চিন্ত বিশ্বাস নিয়ে বসে থাকতে পারে না, যার ফলশ্রুতি এক ধরনের গতিশূন্য স্থবির ভক্তিভাব। তিনি তাঁর বিশ্বাস নিয়ে প্রশ্ন তুলতে সাহস করেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যান এবং যতক্ষণ না বিশ্বাসে দৃঢ়তা অনুভব করেন, ততক্ষণ অন্তরে শান্তি পান না।

ভারতের ইতিহাস এই রকম আধ্যাত্মিক সত্যানুসন্ধানী মানুষদের জীবন-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। সমাজের সমস্ত স্তর থেকেই তাঁরা উঠে এসেছেন, জীবনে সত্য অনুভব করেছেন ও প্রকৃত সাধক বা ধর্মজগতের এক একজন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্তা হয়ে উঠেছেন। প্রসঙ্গত, এর থেকে একটি কথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে একটা মুক্ত সমাজে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মন ও প্রকৃত আধ্যাত্মিক মন বিকশিত হয়ে উঠতে পারে যে কোন জাত-পাত, শিক্ষা বা অর্থকৌলীন্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। তাঁরা ধ্যানে বসেছেন, প্রার্থনা চালিয়ে গেছেন, সংগ্রাম করেছেন, যন্ত্রণা পেয়েছেন, বছরের পর বছর ত্যাগবুদ্ধি নিয়ে কাজ করে গেছেন, জীবনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন যতদিন না জীবনে ঈশ্বরের আলোক অনুভূত হয়। ভৌতবিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলির পেছনেও এইরকম তপস্যা বর্তমান। মাদাম কুরীর যে দৃষ্টান্ত আমরা দিয়েছি, তা এইরকম তপস্যারই এক উদাহরণ। আমাদের ছেলেমেয়েদের যদি ঠিক এই মনোভাবে শুদ্ধ বিজ্ঞান শেখাতে পারি, তাহলে যথাসময়ে শুদ্ধ ধর্মের জন্যেও তারা প্রস্তুত হয়ে উঠবে। দেখা যখন পর্যবেক্ষণে রূপান্তরিত হয় তখনই ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যেই [illegible] শুরু করে তার সত্যের [illegible]ান। যখন পঞ্চেন্দ্রিয় ও [illegible] সত্যানুসন্ধানের উপযোগী [illegible] পরিণত করা হয় এবং চরিত্রগঠনের উপযোগী করে তোলা হয়, তখন সেই প্রশিক্ষণকে বলা যায় শিক্ষা। ধর্ম এই শিক্ষারই ক্রমবিস্তৃত ধারা।

২৬ মৌলিক বিজ্ঞানশিক্ষা

এই ধরনের শিক্ষা আমাদের ছেলেমেয়েরা যত পাবে, ততই আমাদের জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে এই রকম সুগঠিত মনের তরুণদের আমরা পাব। কিন্তু আজকের শিক্ষার দিকে তাকালে দেখি, আমরা এ থেকে অনেক দূরে। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা মস্তিষ্কগুলিকে তথ্যে বোঝাই করে চলেছে, ছাত্রের পঞ্চেন্দ্রিয়ও মনকে গড়ে তুলছে না। এমনকি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের মধ্যে, বিজ্ঞানের স্নাতকদের ধরে নিলেও, অনেকেরই পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত, স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া আরো বেশি সীমিত তাই আজ দেশের প্রয়োজন গাদা-গাদা বিজ্ঞান-স্নাতক শুধুমাত্র নয়, বরং বৈজ্ঞানিক মননসম্পন্ন মানুষের দল যার থেকে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জগতের মহাবীরেরা উঠে আসবেন। এই আশ্চর্য মনের অধিকারি মানুষেরাই তাদের বিদ্যুৎস্পর্শে দেশের পঁচানব্বই কোটি মানুষকে জাগিয়ে তুলবেন। জনসংখ্যার দিক থেকে আমরা বিশাল, কিন্তু গুণমানের বিচারে আমরা ক্ষুদ্র। আমাদের জাতীয় মন 'শ্রদ্ধা' আশ্রয় করুক, এ থেকেই উঠে আসবে সৃজনশীল কল্পনাশক্তি ও যুক্তিশীল চিন্তার ক্ষমতা।

একেই মৌলিক বিজ্ঞানশিক্ষা বলা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের প্রাথমিক বিভাগ থেকে ক্রমশ ওপরের দিকে আমাদের এইরকম শিক্ষা প্রচলিত করা প্রয়োজন। ভৌত-বিজ্ঞানের ইতিহাসে যেসব আবিষ্কারের অজস্র নির্ভরযোগ্য কাহিনী ছড়িয়ে আছে সেগুলির সাহায্যে আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের উৎসাহিত করতে পারব। উদাহরণস্বরূপ, বালক ওয়াট্সের কাহিনী নেওয়া যেতে পারে। বাষ্পের শক্তি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন বলেই তাঁর আবিষ্কার থেকে একদিন স্টিভেনসন ষ্টীম ইঞ্জিন তৈরি করতে পেরেছিলেন। গল্পটা এইরকম, জেমস ওয়াট যখন বালক, তখন একদিন সকালে পরিবারের সকলের সঙ্গে খাবার টেবিলে বসেছিলেন। তাঁর মা

এদিকে প্রাতরাশ তৈরি করছেন। চায়ের জন্যে জলভর্তি কেটলি বসানো ছিল উনুনের ওপরে। বালক কেটলির দিকে তাকিয়ে আছে—ঢাকনাটা মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে। এই ঘটনা তিনি শুধু দেখলেন না, ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলেন। এদিকে মা সকলের সঙ্গে ওয়াট্‌সকেও ডাকছেন খাবার টেবিলে, কিন্তু তিনি শুনতে পাচ্ছেন না। তাঁর সমস্ত মন একাগ্রচিত্তে একটি ঘটনাকেই অনুধাবন করে চলেছে। পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে তাঁর মন ঘটনার একটি বৈশিষ্ট্য কল্পনায় আনতে সক্ষম হয়েছিল—জলীয় বাষ্পের মধ্যে যে লুক্কায়িত শক্তি ঢাকনাকে বারবার তুলে ফেলছে, সে শক্তিকে শৃঙ্খলিত করা যায় ও মানুষের কাজে লাগানো যায়।

সেই অভিজ্ঞতা থেকেই একদিন ষ্টীম ইঞ্জিনের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। এই আবিষ্কার আধুনিক শিল্পবিপ্লবের প্রথম দিককার এক বলিষ্ঠ উপাদান। এই যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, যুক্তিশীল বিচার করবার এই ক্ষমতা ও তীব্র সত্যানুরাগ ব্যাপকভাবে যদি আমাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়, তবেই ভারতবর্ষে আজকের দিনে অত্যন্ত বেশি প্রয়োজন যে বৈজ্ঞানিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব, তা সম্ভব হবে।

২৭ আধুনিক ভারতীয় বৈজ্ঞানিক—একটি উদাহরণ

আমাদের দেশের এক যুবক, অন্ধ্রপ্রদেশের স্বর্গীয় ডাঃ ইয়েল্লাপ্রাগাদা সুব্বা রাও-র মধ্যে আমরা এইরকম বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান-স্পৃহা লক্ষ্য করেছি। কয়েক বছর আগে নতুন দিল্লীতে 'আমেরিকান রিপোর্টার'-এ (১১ জুন, ১৯৫২) যখন আমি প্রথম তাঁর সম্বন্ধে পড়ি, তখন খুবই উৎসাহিত হয়েছিলাম। আমার তখন মনে হয়েছিল, এইরকম 'সুব্বারাও'-এর মতো চেতনা, এইরকম সত্যানুরাগ ও অনুসন্ধানস্পৃহা, এইরকম মানুষের প্রতি ভালবাসা, আমাদের দেশের হাজার হাজার যুবকের মধ্যে জাগাতে হবে—তবেই আমরা এক বিজ্ঞানমনস্ক জাতি হয়ে উঠতে

পারব। তিনি কি করেছিলেন? মাদ্রাজের একটি স্কুলের ছাত্র, সুব্বা রাও খুব উজ্জ্বলছাত্র ছিলেন, যদিও খুবই গরিব, তাঁর ভাই-এর স্প্রু (SPRUE)* খুব বাড়াবাড়ির দিকে গেল। তিনি দেখলেন, তাঁর ভাই ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কারণ তখন ও অসুখের কোন চিকিৎসা ছিল না। অসহায়ভাবে দেখলেন কিভাবে প্রিয় ভাইটি মৃত্যুমুখে ধীরে ধীরে ঢলে পড়ল ; তাঁর কল্পনায় আগুন জ্বলে উঠল। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, 'কেন আমার ভাই এভাবে মরল? এই কঠিন অসুখের কি কোন চিকিৎসা নেই?' সেইক্ষণে তিনি মনে মনে সংকল্প করলেন, তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করবেন এই অসুখের চিকিৎসা-আবিষ্কারে। তপস্যা ও স্বাধ্যায়ের মিলন ঘটল, এই তপস্যা ও স্বাধ্যায় তিনি অনুসরণ করেছেন আমৃত্যু। মহনীয় মহাকাব্য বাল্মীকি রামায়ণে ও ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহে এই তপস্যা ও স্বাধ্যায়ের যুগ্মমিলনের জয়গান উচ্চতানে গাওয়া হয়েছে।

একটি বিদ্যালয়ের গরিব কিশোরের কি অপূর্ব সংকল্প! তবে এই ধরনের সংকল্পের পেছনে যখন থাকে সত্যানুরাগ ও প্রেম তখন এগুলি আর অপরিণত মনের অলস সংকল্প থাকে না। বরং এর পেছনে তখন কাজ করে এক সৃজনশীল, গতিময় মন। অনেক বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক আবিষ্কারে, এমনকি কারাগার-সংশোধন ইত্যাদি অনেক সামাজিক কল্যাণকর্মেও সত্যানুরাগ ও প্রেম একইসঙ্গে কাজ করে। আধুনিক শল্যবিদ্যায় যেসব পচননিবারক ব্যবস্থা নেওয়া হয় সেগুলি এবং পেনিসিলিন বা ঐ জাতীয় অনেক সব ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে এই ভাবে। আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষের নীচে বসে যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে ভগবান বুদ্ধ আধ্যাত্মিক মহাসত্য আবিষ্কার

---

* এক দুরারোগ্য আন্ত্রিক ব্যাধি।

করেছিলেন তার পেছনে ছিল তাঁর মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও করুণা। গান্ধীজীর অন্তরে ছিল কোটি কোটি দেশবাসীকে রাজনৈতিক দাসত্ব ও অসহায় অবস্থার কারাগার থেকে মুক্ত করার বাসনা, তাই তিনি সত্য ও অহিংসার শক্তিতে শক্তিমান হয়ে কারাগারে প্রবেশ করেছিলেন।

যাই হোক, আমরা সুব্বা রাও-এর কথায় ফিরে আসি। বন্ধুদের সাহায্যে তিনি চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করেন। যথাসময়ে তিনি M.B.B.S ও M. S পাশ করেন। মাথায় কিন্তু বরাবর ছিল তাঁর সেই সঙ্কল্প—কেমন করে সেই বিনাশী ব্যাধির ওষুধ আবিষ্কার করা যায়? মাদ্রাজে ডাক্তারী পড়া শেষ করে তিনি গবেষণা চালিয়ে যেতে চাইলেন। ভারতে তখন সেরকম গবেষণার সুযোগ কোথায়? তাই ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইংল্যাণ্ডে যান, সেখান থেকে আমেরিকা। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষক-গোষ্ঠীতে তিনি যোগ দেন। সেখানে অনেক প্রশংসনীয় গবেষণার কাজ করার পাশাপাশি তিনি কাঠোর পরিশ্রম করে Bio-Chemistry বা জৈবিক রসায়নবিদ্যাতে স্নাতক-সম্মান লাভ করেন। এই সময়ে অত্যন্ত সাধারণ কাজও তাঁকে করতে হতো নিজের খরচটুকু রোজগার করার জন্যে। ১৯৪০ সালে নিউইয়র্কের 'আমেরিকান সায়ানিমিড কোম্পানি'র লিডার্লে ল্যাবরেটরী তাঁকে আমন্ত্রণ জানালো তাঁর গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্যে। তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তাঁর নিষ্ঠা ও তাঁর প্রতিভা ঐ ঔষধ-গবেষণাগারের কর্ণধারদের মুগ্ধ করল। ১৯৪২ সাল থেকে উৎসাহদানের পাশাপাশি তাঁরা তাঁদের গবেষকগোষ্ঠীকেও 'সুব্বা রাও'-এর কাজে সহযোগিতা করার ব্যবস্থা করে দিলেন।

বছরের পর বছর চলল টন টন লিভার নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অন্যান্য আবিষ্কারক বিজ্ঞানীদের মতো তাঁকেও হয়তো বারবার হতাশ হতে হয়েছে, বিফল হতে হয়েছে আশানুরূপ ফলাফল না পেয়ে। অবশেষে তিনি সামান্য কিছুটা Folic Acid (ফোলিক্ অ্যাসিড) বিশ্লিষ্ট করতে সক্ষম

হলেন এবং ১৯৪৫ সালে কৃত্রিম ফোলিক্ অ্যাসিডকে হলুদ গুঁড়োর আকৃতিতে সৃষ্টি করতে পারলেন। এইটা এক বড় আবিষ্কার। এরপর হাসপাতালের রুগীদের ওপর চলল তার প্রয়োগ। প্রয়োগ করে অভূতপূর্ব ফল পাওয়া গেল, আর ঠিক তারপরেই ঐ মারাত্মক ব্যাধির ওষুধ বাজারে বেরিয়ে এল।

তিনি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে ঐ আবিষ্কারের জন্য কোন সম্মান নেন নি, বরং সব সম্মান দিয়েছেন তাঁর সহকর্মী বৈজ্ঞানিকদের। কিছুদিন পরেই তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা এক নতুন আশ্চর্যজনক ওষুধ আবিষ্কার করলেন—অরিওমাইসিন (Aureomycin)। এই কাজগুলি চলাকালীন তিনি তাঁর আয় থেকে তাঁর চারিদিকের বহু রোগক্লিষ্ট মানুষের চিকিৎসার খরচ চালাতেন। ১৯৪৮ সালে মাত্র ৫২ বছর বয়সে ডাঃ ইয়েল্লাপ্রাগাদা সুব্বা রাও লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনদানের কাজ করে আমেরিকাতেই মারা যান।

লিডার্লে ল্যাবরেটরী তাঁর স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে তাঁর একটি আবক্ষ মূর্তি বসিয়েছে তাদের বালসার, গুজরাটের ল্যাবরেটরীতে।

সেই মূর্তির তলায় তাঁর বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক, দার্শনিক ও মানবতাবাদী রূপটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় উৎকীর্ণ করা আছে। সেইসঙ্গে এই কথাটিও লেখা আছে—'বিজ্ঞান শুধু জীবনকে দীর্ঘ করে, ধর্ম তাকে করে গভীর।'

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে রাজ্ঞীমাতা বিদুলা তাঁর যুবরাজ-পুত্র সঞ্জয়কে যে কথাটি বলেছিলেন, সুব্বা রাও-এ জীবন সেই কথারই জীবন্ত ভাষ্য ঃ

মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ো
ন তু ধূমায়িতং চিরম্— (১২০/১৫)

'বহুকাল ধরে ধূমায়িত থাকার চেয়ে মুহূর্তের জন্যে জ্বলে ওঠা শ্রেয়'।

আমি সুব্বা রাও-এর উদাহরণটি সকলের সামনে রাখলাম এই বিষয়টির

ওপর জোর দেওয়ার জন্যে যে শুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণায় ও চর্চায় যুক্তিবিচারের পাশাপাশি চাই এইরকম 'শ্রদ্ধা' ও কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য। এর থেকে শুধু বিজ্ঞান নয়, মানবতাবাদও উদ্‌গত হয়। ধর্মে এইরকম কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য আছে ভক্তিমার্গের ঐতিহ্যে ও বিচারশক্তির প্রাচুর্য আছে জ্ঞানমার্গের ঐতিহ্যে।

২৮ হনুমান—একটি প্রাচীন উদাহরণ

বিশ্বাস ও কল্পনাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে 'জ্ঞান', যাতে এই তিনের সমন্বয়ে একটা সমাজকল্যাণের ইচ্ছাশক্তি উঠে আসে। এই ইচ্ছাশক্তি নিঃস্বার্থ বীরোচিত কাজের জন্ম দেয়। 'গীতা'র বুদ্ধিযোগে আধ্যাত্মিকতার এই ব্যাপক রূপটি তুলে ধরা হয়েছে।

আমাদের জাতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে যোগের এই বাস্তব ও ব্যাপক রূপটি ফুটে উঠেছে অন্যতম সুন্দর একটি দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়ে—সেটি হনুমান।

তিনি একদিকে ভক্ত, কল্পনাশক্তির প্রাচুর্যে ভরপুর, অন্যদিকে জ্ঞান, 'বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্'—বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রামনাম-স্তোত্রে আমরা তাঁর এই পরিচয় পাই। সুতরাং একদিকে আছে 'ভক্তি', যার মূলে আছে আ্‌বেগ, কল্পনা ও অনুভূতি—অন্যদিকে আছে 'জ্ঞান', যার মূলে আছে সদসৎ বিচার ও যুক্তিবাদ। এই সবগুলির প্রকাশ তাঁর মধ্যে ঘটেছে প্রবল, নিঃস্বার্থ ইচ্ছাশক্তি ও তার ফলস্বরূপ বীরোচিত কর্মকাণ্ডে। ভগবদ্‌গীতা আমাদের শিখিয়েছে, সেই মানুষই প্রকৃত ভক্ত যিনি তাঁর জীবনে স্বচ্ছ চিন্তাভাবনা, আবেগ ও কল্পনাশক্তির প্রাচুর্য এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সমন্বিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই অমূল্য শিক্ষা ভারতবর্ষের 'সনাতন ধর্ম'-এর। যে কোন বোধহীন বিশ্বাস ও কুসংস্কার ধর্মের অংশমাত্রও নয় ; নানা ধরনের গাঁজাখুরি রূপকথা ও গল্প যার সঙ্গে মানুষের নৈতিক

ও আধ্যাত্মিক দিকের কোন সম্পর্কই নেই তা কখনই ধর্মের অংশ নয় ; আবার কোন সস্তা যাদুবিদ্যা বা অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে বসে থাকাও ধর্ম নয়।

ধর্ম হলো মানবমনের এক সুশৃঙ্খল অভিযাত্রা যা বেরিয়ে পড়েছে অবিনশ্বর ও দৈবী চেতনার খোঁজে। এই অনুসন্ধান চলেছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতার আবরণ ভেদ করে সত্তার গভীরে। আমরা প্রথমদিকে এই অধ্যাত্মচেতনা লাভ করেছি ভৌতবিজ্ঞানের সুশৃঙ্খল গবেষণাপর্বের মধ্যে অথবা সামাজিক ও রাজনৈতিক চর্চায় যে আত্মচেতনার পরিব্যাপ্তি ঘটে তার মধ্যে। এর ফলে মনোসামাজিক ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছে ও মানুষের চরিত্র সুশোভিত হয়ে উঠেছে প্রেম, আত্মত্যাগ ও সেবা প্রভৃতি সুন্দর পুষ্পরাজিতে। কিন্তু যে পরম সত্য লুকিয়ে আছে এই পথের গভীরতম প্রদেশে, সেই সত্যের দেখা মেলে একমাত্র ধর্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলির সাহায্যে অথবা উচ্চ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাধনায়। সকলেরই এই সত্যে সমান অধিকার, জন্মসূত্রে অর্জিত অধিকার। মানুষ এই সত্য তখনই অনুভব করতে পারবে, যখন সে নিজের অন্তরে অনাদি, অনন্ত আত্মাকে ধারণা করতে চাইবে ও সেইসঙ্গে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপী ব্রহ্মকেও অনুভূতির মধ্যে আনতে চাইবে।

২৯ অন্তঃকরণের গভীরে প্রবেশের পদ্ধতি ও সেই অভিযাত্রার ফল

কিভাবে এই চক্ষুদ্বয় একে দেখাতে পারে? কিভাবে কর্ণদ্বয় একে প্রকাশ করতে পারে? পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোনটিই পারে না, এমনকি ইন্দ্রিয়বাসনায় আবদ্ধ মনও নয়। একমাত্র শুদ্ধ, একাগ্র মন যখন শুদ্ধ কল্পনা ও শুদ্ধ ইচ্ছাশক্তিকে আশ্রয় করে 'বুদ্ধি'তে পরিণত হয়, তখন সেই 'বুদ্ধি' সত্যের গভীরে প্রবেশ করতে পারে। কঠোপনিষদে যম

নচিকেতাকে এই সত্য উপদেশ করছেন ঃ (২/৩/৭-৯)

'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহাতোঽব্যক্তমুত্তমম্ ॥'

—ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে মন শ্রেষ্ঠ, মন থেকে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি থেকে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব থেকে অব্যাকৃত বা অব্যক্ত মায়া শ্রেষ্ঠ।

'অব্যক্তাত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি ॥'

—এই অব্যক্ত মায়া থেকেও পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ, যে পরমাত্মা সর্বব্যাপী ও অনুমানের চিহ্নবর্জিত। জীব এই পরমাত্মাকে জেনে অমরত্ব লাভ করে, মুক্ত হয়।

'ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য, ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসভিক্লৃপ্তো, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥'

—এই পরমাত্মার রূপ দৃষ্টির গোচরীভূত হয় না। কেউই একে এই চোখ দিয়ে দেখতে পায় না। মননরূপ সম্যগ্‌দৃষ্টির সাহায্যে বিষয়কল্পনা-শূন্য বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা হৃদয়ে তিনি উপলব্ধ হন। যাঁরা তাঁকে ধারণা করতে পারেন, তাঁরা অমর হন।

এই দেহকে ব্যবচ্ছেদ করুন ও পরীক্ষা করে দেখুন ; আত্মাকে কি দেখতে পান? কখনই না। কারণ এটি আত্মবস্তু, অনাত্মবস্তু নয়। এটি 'দৃক্', দ্রষ্টা, পর্যবেক্ষক, 'দৃশ্যম্' নয়, দর্শনের বিষয় নয়, পর্যবেক্ষণের বিষয় নয়। তাই ভৌতবিজ্ঞানের পদ্ধতি এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। শুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা সেখানেই শেষ হবে যেখানে মানুষ 'দৃশ্যম্' এর অনুসন্ধান করতে করতে অজ্ঞাত 'দৃক্'-এর পারাবারে এসে উপস্থিত হবে। শেষ শ্লোকে তাই বলা আত্মাকে দেখা যায় এক অন্তর্দৃষ্টির সহায়ে, যে অন্তর্দৃষ্টি মানুষ লাভ করে পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের শক্তিকে অন্তর্মুখী করার জীবনব্যাপী সাধনার মধ্য দিয়ে। এই সাধনা দাঁড়িয়ে থাকে নৈতিক

চরিত্র ও একাগ্র মনের ভিত্তির ওপর। ভারতীয় ঐতিহ্য এই বিষয়ের ওপর জোর দেয় যে 'শ্রুতি'র (অর্থাৎ উপনিষদাদির) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বিভিন্ন অনুভূতির ওপর মতামত দেওয়ার কোন অধিকার নেই। সেখানে আমাদের ভৌতবিজ্ঞানের অধিকারকেই স্বীকার করতে হবে। যখন আমাদের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে, আমাদের চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়, সেটা আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা হোক, হোমিওপ্যাথিক হোক অথবা যোগসহায় মনস্তত্ত্ববিদ্যা বা প্রাচীন আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বা প্রাকৃতিক চিকিৎসাই হোক। দেহের ব্যাধি নিরাময়ের জন্যে কোন ধর্মীয় যাদুকর বা অজ্ঞ ব্যক্তির পেছনে ছোটা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু ব্যাধি যেখানে আধ্যাত্মিক দুর্বিপাক, যাকে হিন্দু (ভারতীয়) ঐতিহ্য ষড়রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য) নামে চিহ্নিত করে, সেখানে সাহায্যের জন্যে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের ওপর নির্ভর করাই শ্রেয়। আমাদের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্যে ভৌতবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে, কিন্তু জীবনে প্রেম, দয়া, সহানুভূতি ও আত্মত্যাগ, শান্তি ও পূর্ণতা আনতে হলে চাই অন্তর্জীবনের বিজ্ঞান বা ধর্ম।

ভৌতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় ও তাদের আনীত তথ্যাদির ওপর নির্ভর করি। কিন্তু ধর্মবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়, আমাদের ইন্দ্রিয়সচেতন মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতকে বিদায় দিয়ে এগিয়ে যাই। অধ্যাত্মবিজ্ঞানের চর্চায় একটি অপূর্ব কৌশল হলো ধ্যান। সেখানে প্রথম কাজই হলো ইন্দ্রিয়সমূহ ও ইন্দ্রিয়সচেতন মনের ঊর্ধ্বে ওঠা। ঐ উপকরণগুলি ধ্যানের ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন, কারণ আমরা কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যের অনুসন্ধান তো তখন করি না। যদি সতিই কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যের সন্ধানেই ধ্যানের পরিধি পরিসমাপ্ত হতো, তাহলে ধ্যানের সময় আমাদের মনকে শান্ত করা, চোখ বন্ধ করা ও ইন্দ্রিয়গুলিকে নিশ্চল করে দেওয়ার কোন মানেই থাকত না। বরং আমরা ইন্দ্রিয়গুলিকে

বহির্মুখী রেখে তাদের শক্তিকে নানাদিকে প্রবাহিত করতে পারতাম, যা সাধারণত আমরা আমাদের জাগতিক জীবনে করে থাকি। কিন্তু আমরা অনুভব করি, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার উর্ধ্বে একটা গভীরতর, বিশাল ও আরও অর্থবহ একটি সত্য এবং আমাদেরই ব্যক্তিত্বের এক গভীরতর ব্যঞ্জনা বর্তমান। এই সত্যের স্পর্শ পেতে হলে আমাদের মনকে শান্ত করতে হয়, ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করতে হয়। হিন্দু (ভারতীয়) ঐতিহ্য এই দুটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছে দুই নামে, শম ও দম। জীবের ক্রমবিকাশের দীর্ঘ ইতিহাসে প্রকৃতি মানুষের শরীরে যেমন একটি 'Homeostasis' ঘটিয়েছে, এটা যেন সেই প্রক্রিয়ারই মনের ক্ষেত্রে এক পরিপূরক।

পরমাণুবিদ্যার গবেষণায় যত মানুষের মন ও চেতনার নতুন সংজ্ঞা আমাদের সামনে প্রকাশলাভ করছে, ততই আধুনিক ভৌতবিজ্ঞান এর সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছে। ঠিক একই ঘটনা ঘটছে জীবনবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যখন বিংশ শতাব্দীর জীববিদ্যা জীবের ক্রমবিকাশ নিয়ে ক্রমশ এগিয়ে যেতে যেতে মানুষের ক্ষেত্রে উচ্চতর এক মনোসামাজিক ক্রমবিকাশে এসে পৌঁছেছে। যুদ্ধোত্তর সময়ের বিভিন্ন বিজ্ঞানলেখকেরা এই এক নতুন উদ্দীপক সম্ভাবনার কথা বলছেন। সাইম্যানের (Sieman's) ইলেকট্রো-মেডিকা জার্নালের (৫/১৯৫০ সংখ্যা) একটি প্রবন্ধে এইচ্ স্কিপার্জেস বলছেন ঃ (Aspects of an Upheaval in Medicine—p. 300)

'উপগ্রহ চন্দ্রকে অতিক্রম করে এই মহাবিশ্বের কতটুকুই বা আমরা আবিষ্কার করতে পেরেছি! অন্যদিকে আর এক নতুন মহাবিশ্ব আমাদের আবিষ্কারের অপেক্ষায়—এই প্রকৃতির অন্তর্জগত, আত্মার রাজ্যপাট। পূর্বকথিত এই আত্মার কথা, চেতনার এই গভীরতার কথা মহাকবি গ্যেটে তাঁর কাব্যে ব্যক্ত করেছেন—"অন্তরে রয়েছে আর এক মহাবিশ্ব।"

সেখানেও যে বৈচিত্র্য, যে বহুমুখিনতা তা আমাদের এই আধুনিক পৃথিবী নানা বৈচিত্র্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এই বহির্জগতেও তো একটা জগৎ নয়, একের মধ্যে নানা জগৎ, নানা অবস্থা, নানা প্রত্নতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত, উত্থানের কত নানা বৈশিষ্ট্য। খ্রীস্টজন্মের পরেও যে দ্বিতীয় সহস্রাব্দ শেষ হতে চলেছে, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে তেজস্বী, ঐশ্বর্যশালী সভ্যতার যে গতিময় দৃশ্যাবলী আমরা দেখছি, সেই অভিজ্ঞতা আমাদের এক নতুন দৃষ্টিকোণের, এক নতুন পথরেখার ইঙ্গিত দিচ্ছে যে আমরা সভ্যতার এক দ্বিতীয় আলোকোজ্জ্বল পথের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছি।'

আমরা আগেও যাঁর কথা আলোচনা করেছি, সেই প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার চার্লস সেরিংটন তাঁর স্নায়ুতত্ত্ব-বিষয়ক 'গিফোর্ড বক্তৃতা'য় মানুষের মন ও চেতনার রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চেষ্টা করেছেন ঃ (Lecture—Man on his Nature', p. 266)

'আমরা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যতটা বোধে আনতে পারি, আমাদের মন সেখানে যেন এক বিশেষ জগতের অবয়বশূন্য একটা অস্তিত্ব বা আরও কিছু বেশি। অ-দৃষ্ট, অস্পর্শ, নিরাকার এক বস্তু—আবার এই মন বস্তু-ও নয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার সমর্থন ছাড়াই এর অস্তিত্ব, আর এই অস্তিত্ব চিরকালের।'

এর পাশাপাশি স্যার আর্থার এডিংটনের লেখার কিছু অংশ আমাদের আকৃষ্ট করতে পারে স্যার এডিংটনের কথা আমরা পূর্বেও বলেছি। তিনি তাঁর 'গিফোর্ড বক্তৃতা'য় ঠিক এই ধরনের রহস্যের উল্লেখ করেছেন 'পদার্থ' নিয়ে ঃ (Lecture on the Nature of the physical world)

'পদার্থবিদ্যার ভাষায় আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবন, আমাদের অতিপরিচিত জীবননাট্যকে দেখি যেন এক ছায়ামূর্তির খেলায়। আমার কনুই-এর ছায়া যেন টেবিল-এর ছায়াতে পড়েছে—আর কালিরূপ ছায়া

কাগজরূপী ছায়ার ওপর লিখে চলেছে। ...ভৌতবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আধুনিক আবিষ্কার হলো এই আধুনিক উপলব্ধি যে ভৌতবিজ্ঞানের যা কিছু গবেষণা ও ক্রিয়াকর্ম, তা এই ছায়ার জগৎকে নিয়ে।'

৩০ স্থবিরতাপ্রাপ্ত ভক্তিভাব বনাম গতিশীল আধ্যাত্মিকতা

বেদান্ত যেভাবে গভীরে তার অনুসন্ধান চালিয়েছে, সেই অনুসন্ধানের আলোয় ভারতবর্ষ তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পেরেছে যে 'শ্রদ্ধা' বা বিশ্বাস এবং যুক্তিবাদ বা বিচারশীলতার প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতা করা, বিরোধে জড়িয়ে পড়া নয়—তা ভৌতবিজ্ঞান বা অধ্যাত্মবিজ্ঞান, যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন। আপনার যুক্তিবাদী ভাবনাকে যত শক্তিশালী করে তুলবেন, আপনার ধর্মজীবন ততই সুন্দর হবে। অনিয়মিত, নির্বোধসুলভ একটা কল্পনা, বা ঐরকম ক্ষণস্থায়ী একটা আবেগ ভক্তি নয়। স্বয়ং ভগবান, যিনি অনন্ত প্রেমস্বরূপ, তাঁকে লক্ষ্য করে যে ভাবাবেগ তা-ই ভক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—'ভক্ত হবি, তা বলে বোকা হবি কেন?' জ্ঞানরূপ শক্তির অভাবে, যুক্তিবাদিতার অভাবে আমাদের দেশের মানুষ আজ অজ্ঞতায় পূর্ণ—যারা ভক্ত নামে পরিচিত। এই ভক্তরাই প্রবঞ্চিত হয় ভণ্ড গুরু ও অলৌকিক ভেল্কি দেখাবার সব প্রবঞ্চকদের হাতে। যেহেতু সমস্ত যুক্তিবিচার ও জ্ঞানের প্রয়োগ তাঁরা ধর্মজীবন থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন, তাই প্রবঞ্চিত হবার জন্যেই যেন তাঁরা আগে থেকে প্রস্তুত। সত্যান্বেষণে তাদের আগ্রহ নেই, তাদের আগ্রহ একটু ভাবপ্রবণতা, একটু ধর্মীয় সংবেদনশীলতা—এতেই শেষ। যখন আমাদের দেশের মানুষ ধর্মকে সঠিকভাবে বুঝবে, বুঝবে যে এটা একটা বিজ্ঞান, ভৌতবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো যুক্তি ও বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে একেও এগোতে হবে, তখনই আমরা দেশে প্রকৃত ধর্ম বা এক গতিশীল আধ্যাত্মিকতার ক্রমবিকাশ দেখতে পাব। সঙ্গে সঙ্গে আজকের দিনে ধর্মের নামে অনেক

মানুষ যে গোলমেলে, লোকদেখানো এক স্থবিরতাপ্রাপ্ত ভক্তিভাব বা ভক্তির নামে সাংসারিক স্থূল উদ্দেশ্যসাধনের যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তা-ও ক্রমশ বিনষ্ট হবে।

৩১ বিশ্বাস ও যুক্তি বনাম ভেল্কিবাজি

যতদিন সাধারণ মানুষ ভেলকিবাজি ও যাদুবিদ্যার পেছনে ছুটতে থাকবে, সত্যিকারের আম আর যাদুবিদ্যার নকল আম—এ-দুটোর প্রভেদ করতে পারবে না, ততদিন বিশ্বাস, যুক্তি ও অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মবিজ্ঞান বেড়ে উঠতে পারবে না। ধর্মের সঙ্গে যাদুবিদ্যাকে মিলিয়ে দেওয়ার অর্থ ধর্মকে দূষিত করা, তাকে হত্যা করা। বিশ্বাস, যুক্তি ও তথ্যাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক ভৌতবিজ্ঞান তখনই বিকাশ লাভ করেছে যখন এই চর্চা যাদুবিদ্যা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। ধর্মবিজ্ঞান সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। প্রকৃত যাদু বা ভেল্কি যদি ধর্মবিজ্ঞানে সত্যিই থাকে, তা হলো চরিত্রের শক্তি, নির্ভীকতা, শান্তি, প্রেম, সেবা ও আত্মত্যাগ—ঠিক যেমন ভৌতবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যিকারের যাদু ও ভেল্কি হলো স্বচ্ছ চিন্তা, মানুষের শারীরিক ও সামাজিক কল্যাণের এক সার্বিক প্রচেষ্টা ও প্রযুক্তিজগতের বিস্ময়কর ঘটনাপ্রবাহ।

আধুনিক ভৌতবিজ্ঞানীদের মতো ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আচার্যগণ প্রমাণিত সত্য ও প্রমাণ করা যায় এমন সত্যই শিক্ষা দিতেন। এই সত্যই আমরা পাই উপনিষদে, গীতায় ও নানা গ্রন্থে, বিশেষত যেখানে বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের মতো আচার্যগণের শিক্ষা ছড়িয়ে আছে।

সত্যি কথা বলতে কি, বুদ্ধের একটি বাণী আমি ভারতবর্ষের অথবা পাশ্চাত্যের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে বারবার বলতে চাই আর তা হলো তাঁর আদেশ যে, প্রত্যেকটি শিক্ষণীয় বিষয়কে যুক্তিবিচারের সাহায্যে যাচাই করে তবেই বিশ্বাস কর। বৌদ্ধসাহিত্যে এটি 'কালামাসের প্রতি

অনুজ্ঞা' নামে পরিচিত। গোপনীয়তা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলেও বুদ্ধ যা বলেছেন তা ভারতের প্রত্যেকটি ছাত্র মনে রাখুক এটা আমি চাই, সেই ছাত্র বিজ্ঞান ও ধর্ম যে ক্ষেত্রেরই হোক না কেন। এইভাবেই আমাদের দেশে এক সার্বিক বিজ্ঞান-বিপ্লব ঘটবে, বহির্জগতে ও আধ্যাত্মিক অন্তর্জগতে। শিষ্য আনন্দকে সম্বোধন করে বুদ্ধ বললেন—তথাগতের (বুদ্ধের) কাছে গোপনীয়তা কিছু নেই। বুদ্ধের শিক্ষা ছিল মুক্ত—'এহি পস্‌স', 'এহি পস্‌স'—এসো ও দেখো, এসো ও দেখো। ঠিক এইভাবেই তিনি ব্যাখ্যা করতেন। বুদ্ধ বললেন—আনন্দ, গোপনীয়তা তিনটি বিষয়ে, কোন্ তিনটি? একটি পুরোহিততন্ত্রে, দ্বিতীয়টি ভ্রান্ত মতবাদে আর একটি দেহোপজীবিনীদের মধ্যে। যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধের এই উচ্চারণ। যদি আমাদের দেশের মানুষ বুদ্ধের এই দুটি বাণীকে অন্তরে গ্রহণ করে, ভারতবর্ষে আমরা প্রকৃত ধর্ম ও প্রকৃত বিজ্ঞানের বিকাশ ও সমৃদ্ধি দেখতে পাব।

৩২ উপসংহার

বেদান্ত এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছে যে ভৌতবিজ্ঞান ও ধর্ম এই উভয়ের ক্ষেত্রে সত্যানুসন্ধানী এক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তকে যাচাই করে নেওয়ার এক বৈজ্ঞানিক মনোভাবই হলো সর্বসাধারণের শিক্ষণীয় পদ্ধতি। একজন বৈজ্ঞানিক তার পরীক্ষাগারে সত্য আবিষ্কার করেন ও কোন বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন। অন্য কোন বৈজ্ঞানিক সে সত্যটি পরীক্ষা করেন, যাচাই করেন। সেটাও যথেষ্ট হয় না। আরও অনেক গবেষক পুনরায় যাচাই করেন। তবেই সেটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের উপনিষদে যে ধর্মবিজ্ঞানের জগৎ সেখানেও পদ্ধতি একই। মানুষের দেহ, মন, স্নায়ুমণ্ডলী ইত্যাদির পেছনে যে এক দৈবী সত্তা বিরাজমান, সে সত্য আবিষ্কার

করেছিলেন কোন এক ঋষি। তিনি তার নাম দিয়েছিলেন আত্মা। অন্য এক ঋষি এই সিদ্ধান্তকে প্রথমে প্রতিপক্ষ হিসেবে নিয়েছেন, যাচাই করেছেন ও শেষে এই সত্যে উপনীত হয়েছেন। এইভাবে বহু সাধকের বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশেষে মানুষ সম্বন্ধে মানুষের অনন্ত সম্ভাবনা সম্বন্ধে, এই সত্য মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দৃষ্টিতে যে মানুষ জৈবিক ক্রিয়াকর্মে সীমাবদ্ধ, সেই মানুষের পরিমাপ যে অনন্ত—এই সত্য আজ বিঘোষিত। এটা তাই কোন ব্যক্তিবিশেষের মতামত নয় ; মানুষ সম্পর্কে, মনুষ্যজাতি সম্পর্কে এক গভীরতম সত্য। এই সত্যকে নিজের উপলব্ধির পথে আবিষ্কার করতে পারে যে কোন মানুষ। সেইজন্যই ব্রহ্ম-সূত্রের মহাভাষ্যকার শঙ্করাচার্য একে বস্তু-তন্ত্র-জ্ঞান অর্থাৎ বস্তুনির্ভর বা ঘটনানির্ভর বা সত্যনির্ভর জ্ঞান বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

তাই এই সত্য ঘোষণা করে—বেদাহমেতম্—'আমি একে ধারণা করেছি' ; আমি একে জেনেছি, শুধু বিশ্বাস করে থাকি নি ; যে কেউ এই সত্য ধারণা করতে পারে। ভাষার দিকে লক্ষ্য করুন, কারণ যে সংবাদ দেওয়া হচ্ছে সেটি একটি সত্য, যে সত্য পরীক্ষিত এবং সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষণীয়।

তিন হাজার বছর আগেকার উপনিষদের সেই ঋষিদের সময় থেকে আজকের যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ পর্যন্ত এই হলো ভারতীয় আধ্যাত্মিতার প্রকৃত মর্মবাণী এই অধ্যাত্মবিজ্ঞান যুক্তিবাদী বিচারধারাকে, প্রাচীন ও আধুনিক ভৌতবিজ্ঞানের একে গ্রহণ করবার মানসিকতাকে, এঁর অবিচ্ছিন্ন জীবনীশক্তিকে আবাহন করেছে, নিজের মধ্যে গ্রহণ করে নিয়েছে।

নির্দেশিকা